পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০১৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬ তম বর্ষপূর্তিতে রাঙ্গামাটির গণসমাবেবে বক্তব্য রাখছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার (উপরে), নীচে গণসমাবেশের একাংশ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

২ ডিসেম্বর ২০১৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ॥ ২ ডিসেম্বর ২০১৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর ২০১৪ জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

Parbatya Chattagram Chukti Bastabayan Prasange \ 2 December 2014

published by Information and Publicity Department of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2014 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.

Telefax: +880-351-61248, E-mail: pcjss.org@gmail.com,

Web: www.pcjss-cht.org

Price : Tk. 50.00 only

সূচিপত্র

বিষয়

সম্পাদকীয় ■ পৃষ্ঠা ৪ - ৬

প্রথম অংশ: পৃষ্ঠা ৭ - ৪৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন

ক. সাধারণ ■ পৃষ্ঠা ৯ - ১২

- পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান
- সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কার্যকারিতা

খ. পার্বত্য জেলা পরিষদ ■ পৃষ্ঠা ১২ - ২৪

- অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ
- সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান
- স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন
- কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ
- উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম
- পার্বত্য জেলা পুলিশ
- ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা পরিষদের এখতিয়ার
- পরিষদের বিশেষ অধিকার
- পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ■ পৃষ্ঠা ২৪ - ৩০

- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন
- পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়
- সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন
- উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার
- ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান
- ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ
- অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন

ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী ■ পৃষ্ঠা ৩০ - ৪৮

- উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন
- আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন
- ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত
- ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি
- রাবার চাষের ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ
- কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান
- উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষকতা
- জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান
- সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার
- জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকরিতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন
- সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার
- সকল প্রকার চাকরিতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ
- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় অংশ: পৃষ্ঠা ৪৯ - ৮৬
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য ও তৎপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মতামত

তৃতীয় অংশ: পৃষ্ঠা ৮৭ - ১০০
বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দীর্ঘ ১৭ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এই ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখেছিল পার্বত্যবাসী। আশা করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এতদাঞ্চলের মানুষের শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে। এই শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এতদাঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীরা নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই নির্ধারণ করার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা তৈরি হবে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭ বছরেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে আজ অবধি পার্বত্যবাসীর সেই শাসনতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব যেমনি নিশ্চিত হয়নি, তেমনি অর্জিত হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সেই কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ৩ বছর ৮ মাস রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে শেখ হাসিনা সরকার পাবত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কিছু বিষয় যেমন- চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন; আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন; ভারত থেকে জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন; চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এবং ভূমি কমিশন ও টাস্কফোর্স গঠন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় ছয় বছর অতিক্রান্ত হলেও কতিপয় বিষয় বা কর্ম তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয় ও কার্যাবলী কার্যকরকরণ এবং এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ; আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ ও তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসন; সেনা শাসন 'অপারেশন উত্তরণ'সহ সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিলকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ; চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বর্তমান মহাজোট সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) চুক্তির পূর্বে হস্তান্তরিত বিষয়/বিভাগের অধীন ৭টি কর্ম এবং বর্তমান মেয়াদে ২০১৪ সালে জুম চাষ, মাধ্যমিক শিক্ষা, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান, মহাজনী কারবার ও পর্যটন (স্থানীয়)- এই পাঁচটি বিষয় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন- জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন; ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; পুলিশ (স্থানীয়); সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ; পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়সমূহ এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, যেসব বিষয় বা কর্ম/প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরিত হয়েছে সেগুলোও ত্রুটিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যেমন- গত ২৮ আগস্ট ২০১৪ পর্যটন (স্থানীয়) বিষয়টি পর্যটন মন্ত্রণালয় ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যকার চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু পর্যটন বিষয়টি যথাযথভাবে হস্তান্তরিত হয়নি। উক্ত চুক্তিতে পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পার্বত্য জেলা পরিষদের এখতিয়ার সীমিত রেখে পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ পর্যটন কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রাইভেট সেক্টর নিজস্বভাবে ইকো-ট্যুরিজম কমার্শিয়াল পর্যটন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবে।

সরকার একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তালবাহানা করে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে দেশে-বিদেশে অসত্য, বিভ্রান্তিমূলক ও মনগড়া বক্তব্য প্রচার করে আসছে। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের অনেক মন্ত্রী-আমলারা প্রচার করে আসছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মোট ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ধারাগুলোর মধ্যে ১৫টি ধারার আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাকি ৯টি ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের উক্ত বক্তব্য বা প্রতিবেদন সর্বাংশে সত্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মূল্যায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সর্বমোট ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে। আর অবাস্তবায়িত রয়েছে ৩৪টি ধারা এবং আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ১৩টি ধারা। তার অর্থ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। যেমন 'ক' খন্ডের ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার যে দাবি করছে বস্তুত উক্ত চারটি ধারার মধ্যে প্রথম তিনটি ধারাই এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। এই তিনটি ধারা কেবল অবাস্তবায়িত অবস্থার মধ্যে রেখে দেয়া হয়নি, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার চরমভাবে লঙ্ঘন করেও চলেছে। এই অপপ্রচারের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে অসত্য, বিভ্রান্তিমূলক ও মনগড়া বক্তব্য প্রচার করে দেশ-বিদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করা। এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো সরকার সম্পূর্ণ বা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করছে সেগুলো কার্যত বাস্তবায়ন তো হয়ই নি, উপরন্তু চরমভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে।

সরকার কেবল চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বছরের পর বছর ধরে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে দিয়ে কিংবা চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে অসত্য, বিভ্রান্তিমূলক ও মনগড়া তথ্য দিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, অধিকন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্মস্বার্থ বিরোধী আইন প্রণয়ন ও কার্যক্রম হাতে নিয়ে চলেছে। চুক্তির অবাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ না নিয়ে সরকার উল্টো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে বা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে এবং পরামর্শ করে আইন প্রণয়নের যে বিধান রয়েছে সেই আইনী বিধিব্যবস্থাকে পদদলিত করে একতরফাভাবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন প্রণয়ন এবং রাঙ্গামাটিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও পার্বত্যাবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে এই অগণতান্ত্রিক ও জনবিরোধী আইন প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণের ফলে, সর্বোপরি আদিবাসী জুম্মদের অধিকার ও অস্তিত্বকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেয়া হলে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এভাবে সরকারের তালবাহানার নীতি অব্যাহত থাকলে তার জন্য সরকারকেই চরম খেরাসত দিতে হবে।

সম্প্রতি বিজিবি, সেনাবাহিনী, বন বিভাগ, বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তি, সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় জুম্মদের আবাসভূমি ও ধর্মীয় স্থানসহ রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় ভূমি বেদখল এবং স্বভূমি থেকে তাদেরকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি নানা উদ্যোগের পাশাপাশি বিশেষ করে সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই বেদখলের প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। বিশেষ করে সেনাক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে যত্রতত্র বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের তৎপরতা। এর সাথে পাল্লা দিয়ে আদিবাসী জুম্মদের আবাসভূমি, জুমভূমি, ভোগদখলীয় ও

বিচরণভূমিতে অহরহ গড়ে তোলা হচ্ছে বিভিন্ন পর্যটন স্পট, রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, বিলাসবহুল মোটেল ইত্যাদি নানা বিনোদন ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এতে অনেক আদিবাসী জুম্ম পরিবার হয় ইতোমধ্যে নিজের বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, নতুবা অনেকেই উচ্ছেদের মুখে রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নে অব্যাহত গড়িমসি ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্রের কারণে রাষ্ট্রযন্ত্রে বা রাষ্ট্রযন্ত্রের বাইরে ঘাপতি মেরে থাকা সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী এবং উগ্র জাতীয়তবাদী শক্তি তাদের অপতৎপরতা বৃদ্ধি করেছে। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে এসব অপশক্তি তিন পার্বত্য জেলায় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী জঙ্গী তৎপরতা জোরদার করেছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পশ্চাদভূমি হিসেবে ব্যবহার করে সারাদেশে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক জঙ্গী তৎপরতা বিস্তৃত করে চলেছে। তারা সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত করে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় নিরাপত্তা বাহিনী ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এ সরকারের আমলে অন্তত ৭টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। গত ৩ আগস্ট ২০১৩ তারিখে সংঘটিত মাটিরাঙ্গা-তাইন্দং-এর সাম্প্রদায়িক হামলা হলো তার অন্যতম একটি ঘটনা। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৫ জুলাই ২০১৪ রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশনের সফররত সদস্যদের উপর সেটেলার বাঙালিদের উগ্র সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সন্ত্রাসী কর্তৃক নৃশংস হামলা করা হয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে আদিবাসী নারীর উপর সহিংসতার মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অতি সম্প্রতি সেপ্টেম্বর-নভেম্বর তিন মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতল অঞ্চলে কমপক্ষে ১৬ জন আদিবাসী নারী যৌন ও শারীরিক সহিংসতা ও অপহরণের শিকার হয়েছে।

অপরদিকে প্রশাসনের একটি বিশেষ মহলের ছত্রছায়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ও সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত বিপথগামী গোষ্ঠী অবাধে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর এযাবৎ এই চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা জনসংহতি সমিতির ৯৩ জন সদস্যসহ তিন শতাধিক লোককে খুন ও অসংখ্য নিরীহ লোককে অপহরণ ও নির্যাতন করে। সরকারের নির্লিপ্ততা তথা প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ মদদদানের কারণে সংস্কারপন্থী-ইউপিডিএফ এভাবে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে।

বস্তুত: বর্তমানে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে অনিশ্চিয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সরকারের আলামত দেখে এটা স্পষ্ট বলা যায় যে, সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের আর কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। দেশ-বিদেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য বড়জোর বুলিতে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাবে। আর চুক্তি বাস্তবায়নের নামে কোন কিছু উদ্যোগ নিলেও তা চুক্তি বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে চুক্তি পরিপন্থী বা জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী কার্যক্রম হাতে নেবে; যার মূল লক্ষ্যই হলো আদিবাসী জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূল করা আর অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা। বস্তুত দেশের সামগ্রিক স্বার্থেই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই এ চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যই হচ্ছে প্রধান। এমতাবস্থায় আর বিলম্ব না করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সময়সূচি ভিত্তিক কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সরকারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ও জুম্মস্বার্থ বিরোধী সকল কার্যক্রম প্রতিরোধ করা এবং জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমি অধিকার সংরক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দেশের নাগরিক সমাজসহ পার্বত্যবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে।

প্রথম অংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬ বছর
ভূমি আগ্রাসন ও জুম্ম জাতি বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করুন
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সোচ্চার হউন
গণসমাবেশ
২ ডিসেম্বর ২০১৩ সোমবার
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬ বছর
ভূমি আগ্রাসন ও জুম্ম জাতি বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করুন
পার্বত্যবাসীদের অস্তিত্ব ও অধিকার সংরক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সোচ্চার হউন
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে
গণ সমাবেশ
প্রধান অতিথি: শ্রী সুবর্ণ চাকমা, সহ-সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা শাখা
সভাপতি : শ্রী উৎপলাক্ষ চাকমা, সহ-সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাঘাইছড়ি থানা শাখা
স্থান : শিজক কলেজ মাঠ
তারিখ: ২রা ডিসেম্বর ২০১৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, বাঘাইছড়ি থানা শাখা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন

.....

চুক্তির প্রস্তাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রস্তাবনা অংশে উল্লেখ আছে যে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেন।

(ক) সাধারণ

পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি ও এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান

চুক্তির ১নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বিধান অনুযায়ী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সমুন্নত রাখা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে 'উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য'কে ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসন; সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা; বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ; ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান; চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান; ভূমি বেদখল; বহিরাগতদের নিকট ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান; জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে নতুন করে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো; তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' গঠনের মাধ্যমে সেটেলার বাঙালিদের সংগঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা; ভূমি জরিপের মাধ্যমে সেটেলার কর্তৃক জবরদখলকৃত ভূমি বৈধতা প্রদানের পাঁয়তারা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে।

পূর্ববর্তী সরকারের মতো আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহত রয়েছে। এ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ৭টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। সর্বশেষ গত ৩ আগস্ট ২০১৩ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং এলাকায় সেটেলার বাঙালিরা নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতে জুম্মদের ১১টি গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে ৩৬টি ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ২৬১টি বাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুর করে। এর আগে ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটি শহরে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলায় শতাধিক জুম্ম ও ৯ জন বাঙালি আহত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যালয় ও বিশ্রামাগারে হামলাসহ জুম্মদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাত ভাঙচুর করা হয়। অপরদিকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় ও মানিকছড়ি

উপজেলায় সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে জুম্মদের ১১০টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত এবং ১৭ এপ্রিল ২০১১ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার বগাচদর এলাকায় হামলা চালিয়ে ২১টি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয় এবং লুটপাট করা হয়।

নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার তথ্যাবলী দেওয়া গেল-

সাম্প্রদায়িক হামলা	তারিখ	বাড়ির সংখ্যা		নিহত	আহত	ধর্ষণ/ যৌন হয়রানি
		ভস্মীভূত	লুটপাট/ তছনছ			
বাঘাইহাট হামলা	৪ এপ্রিল ১৯৯৯	--	--	--	৫১	১
বাবুছড়া হামলা	১৬ অক্টোবর ১৯৯৯	-	৭৪	৩	১৪০*	১
বোয়ালখালী-মেরুং	১৮ মে ২০০১	৪২	১৯১	--	৫	--
রামগড় হামলা	২৫ জুন ২০০১	১২৬	১১৮	--	অসংখ্য	--
রাজভিলা হামলা	১০ অক্টোবর ২০০২	১১	১০০	--	৩	--
ভূয়াছড়া হামলা	১৯ এপ্রিল ২০০৩	৯	--	--	১২	--
মহালছড়ি হামলা	২৬ আগস্ট ২০০৩	৩৫৯	১৩৭	২	৫০	১০
মাইসছড়ি হামলা	৩ এপ্রিল ২০০৬	-	১০০	-	৫০	৪
সাজেক হামলা	২০ এপ্রিল ২০০৮	৭৮	৭৮	-	-	-
বাঘাইহাট হামলা	১৯-২০ ফেব্রু ২০১০	৪৩৭	-	২	২৫	-
খাগড়াছড়ি হামলা	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০	৬১	-	-	-	-
লংগদু হামলা	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১	২১	৬	-	-	-
রামগড়-মানিকছড়ি	১৭ এপ্রিল ২০১১	১১১	-	২	২৫	-
বাঘাইছড়ি-দীঘিনালা	১৪ ডিসেম্বর ২০১১	-	-	১	১০	-
রাঙ্গামাটি	২২-২৩ সেপ্টে ২০১২	-	১১	-	১১৭	-
তাইন্দং-মাটিরাঙ্গা	৩ আগস্ট ২০১৩	৩৬	২৬১	১	১২	-

অপরদিকে মায়ানমার থেকে আগত শত শত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থী প্রশাসনের পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষ সহায়তায় বান্দরবান জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করছে। তারা ভোটার তালিকাভুক্ত হচ্ছে এবং স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র নিয়ে নানা সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে। সরকার পূর্বের মতো ২০১৪ সালে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার সময়ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন করেছে।

সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী ও রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনকরণের বিধান

এই খন্ডের ২নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের বিধান করা হলেও এক্ষেত্রে সরকার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২, ভোটার তালিকা বিধিমালা ১৯৮২, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০, খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১, এনজিওদের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীর পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু সরকার খসড়া সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০১ ব্যতীত এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে বন আইন, ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল, পৌরসভা আইন সাধারণ প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ইত্যাদি আইনসমূহও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি। ফলে চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি

এই খন্ডের ৩নং ধারায় চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধিকে আহ্বায়ক এবং এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতিকে সদস্য করে একটি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করার বিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) উক্ত কমিটি গঠিত হয়। এরপর চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০২-২০০৬) এবং ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৭-২০০৮) উক্ত কমিটি গঠন করা হয়নি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত ২৫ মে ২০০৯ সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগের মধ্য দিয়ে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির স্বতন্ত্র কোন দপ্তর নেই, কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনে কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি এবং কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন তহবিল প্রদান করা হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠিত হওয়ার পর গত ১৯ আগস্ট ২০০৯ রাঙ্গামাটিতে, ২৬ অক্টোবর ২০০৯ ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনে, ২৬ ডিসেম্বর ২০১০ খাগড়াছড়িতে, ২২ জানুয়ারি ২০১২ জাতীয় সংসদ ভবনে ও ২৮ মে ২০১২ জাতীয় সংসদ ভবনে মোট পাঁচবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ দুই সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনকল্পে ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং জাতীয় সংসদের বর্তমানে চলমান বাজেট অধিবেশনে পাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২২ জানুয়ারি ২০১২ অনুষ্ঠিত ৪র্থ সভায় সংশোধনের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে চূড়ান্তকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ কমিশন আইন ২০০১ এর ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয় এবং তা জাতীয় সংসদের তৎসময়ে চলমান শীতকালীন অধিবেশনে পাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য সরকার কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত ৫ম সভায় আবারও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনকল্পে ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং জাতীয় সংসদের তৎসময়ে চলমান বাজেট অধিবেশনে পাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তও কার্যকর করা হয়নি।

গত ১২ জানুয়ারি ২০১৪ নতুন সরকার গঠনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে এখনো কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি বা কমিটির কোন সভা আহ্বান করা হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কার্যকারিতা

এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করার তারিখ হতে বলবৎ হবে এবং বলবৎ হওয়ার তারিখ হতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে বদিউজ্জামান ও ২০০৭ সালে এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলায় গত ১২-১৩ এপ্রিল ২০১০ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাই কোর্ট বিভাগ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে অবৈধ বলা হয়েছে বলে যে রায় দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ এপ্রিল ২০১০ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত হাইকোর্টের রায়কে ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। পরবর্তীতে এই স্থগিতাদেশ নিয়মিত আপিল মামলা পর্যন্ত বর্ধিত হয়। সর্বশেষ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আপিল

আবেদনের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্টের রায় স্থগিতাদেশ জারি করে। ইহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, উক্ত আপিল আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সরকারের মধ্যে চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বলাবাহুল্য, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তির সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের দাবি করা হয়েছিল। তখন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই তাদের পক্ষে সাংবিধানিক গ্যারান্টি বা স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে না। তবে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তারা তা প্রদান করবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অথচ সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরেও গত ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দাবি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন-১৯৯৮ এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন-১৯৯৮ (সংশোধন) সংবিধানের ১নং তফশিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কালে এ বিষয়ে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং বর্তমান সংসদেও এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

(খ) পার্বত্য জেলা পরিষদ

চুক্তির এ খন্ডে বলা হয়েছে যে, উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হয়েছেন। এই বিধান মোতাবেক-

ক) ১৯৯৮ সালের ৩, ৪ ও ৫ মে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ করা হয়। তবে জেলা পরিষদ আইনসমূহে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক অনেকগুলো বিষয় ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়সমূহ চুক্তির সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সংশোধিত হয়।

খ) পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮ নম্বর ধারা চুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে সংশোধন করা হয়।

গ) এই খণ্ডের ২নং ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে আর সে অনুযায়ী পরিষদকে পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। ক্ষমতাসীন দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অন্তর্বর্তী জেলা পরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিকভাবে বছরের পর বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুত: এসব ৫-সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন পরিষদসমূহের জনগণের কাছে কোন দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামতকে উপেক্ষা করে সরকার ২৩ নভেম্বর ২০১৪ অন্তর্বর্তী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আকার চেয়ারম্যানসহ ৫ সদস্য থেকে ১৫ সদস্যে বাড়িয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪ বিল জাতীয় সংসদে পাশ করেছে যার মূল উদ্দেশ্য

হচ্ছে এসব পরিষদের নির্বাচনকে অব্যাহতভাবে পাশ কাটিয়ে পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য হিসেবে দলীয় সদস্যদের মনোনয়ন দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিষদসমূহ পরিচালনা করা।

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যবিধিমালা এখনো যথাযথভাবে প্রণীত হয়নি।

চ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মোট ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে ১৭টি বিষয়[১] হস্তান্তরিত হয়েছে। তৎমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্বে ১১টি বিষয় হস্তান্তরিত হয়েছে। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে যুব উন্নয়ন বিষয় (রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পরিষদে) এবং পূর্বে হস্তান্তরিত শিক্ষা বিভাগের অধীনে ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। মহাজোট সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০০৯-১৩) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (খাগড়াছড়ি পরিষদে), স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অধীনে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি কার্যালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের অধীন রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারি) এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীন সরকারি শিশু সদন মোট ৭টি কর্ম/অফিস হস্তান্তর করা হয়েছে। মহাজোট সরকারের বর্তমান মেয়াদে ২০১৪ সালে মাধ্যমিক শিক্ষা, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান, জুম চাষ, পর্যটন (স্থানীয়) ইত্যাদি হস্তান্তরিত হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশেষ করে জেলার আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), বন ও পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এখনো হস্তান্তর করা হয়নি।

ছ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা হয়নি। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তিন চেয়ারম্যানগণের উপমন্ত্রীর মর্যাদা পুন:প্রদানের ব্যবস্থাও ঝুলিয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে নানাভাবে এসব আইনকে খর্ব করা হচ্ছে।

নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের বাস্তবায়নের অবস্থা উল্লেখ করা গেল-

অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ

এই খন্ডের ৩ নং ধারায় বলা আছে যে, "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত: বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।

১৯৯৮ সালে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণয়ন কালে 'বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি' এর মধ্যে অবস্থিত 'এবং' শব্দটির পরিবর্তে 'বা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়। প্রবল প্রতিবাদের মুখে অবশেষে ১৯৯৮ সালের ২৩ নং আইন দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক 'এবং' শব্দটি সন্নিবেশিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২১/১২/২০০০ তারিখে ইস্যুকৃত প্রশাসনিক আদেশের ক্ষমতা বলে আইনটি লঙ্ঘন করে বৈধ জায়গা জমি না থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ বহিরাগতদেরকে অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে সনদপত্র প্রদান করে যাচ্ছেন এবং এর বদৌলতে অস্থায়ী বহিরাগতরা ভূমি বন্দোবস্তীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকরি ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে যাচ্ছে এবং জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

[১]তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩৩টি বিষয়ের মধ্যে এযাবৎ হস্তান্তরিত ১৭টি বিষয়/প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো: ১। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ- (ক) হর্টিকালচার সেন্টার, (খ) বিএডিসি ও (গ) তুলা উন্নয়ন বোর্ড; ২। স্বাস্থ্য বিভাগ- (ক) পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, (খ) পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, (গ) রাঙ্গামাটি নার্সিং ইনস্টিটিউট ও (ঘ) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; ৩। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ; ৪। শিল্প ও বাণিজ্য- (ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, (খ) বাজারফান্ড প্রশাসন ও (গ) টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; ৫। সমবায় বিভাগ; ৬। সমাজসেবা বিভাগ- (ক) সরকারি শিশু সদন; ৭। মৎস্য বিভাগ- (ক) রামগড় মৎস্য খামার; ৮। প্রাণি সম্পদ বিভাগ; ৯। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; ১০। সংস্কৃতি- (ক) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, (খ) শিল্পকলা একাডেমী, (গ) পাবলিক লাইব্রেরি; ১১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর; ১২। ক্রীড়া বিভাগ- (ক) জেলা ক্রীড়া সংস্থা; ১৩। জুম চাষ; ১৪। মাধ্যমিক শিক্ষা; ১৫। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান; ১৬। মহাজনী কারবার এবং ১৭। পর্যটন (স্থানীয়)।

সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান

এই খন্ডের ৪নং ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কেবলমাত্র তিন সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনকে লঙ্ঘন করে তিন সার্কেল চীফের পাশাপাশি তিন পার্বত্য ডেপুটি কমিশনারগণও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ জারিকৃত এক প্রশাসনিক আদেশের পর থেকে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃকও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে যা বিধিসম্মত নহে। এছাড়া "চার্টার অফ ডিউটিজ অফ ডেপুটি কমিশনারস্" পরিপত্রে ডেপুটি কমিশনারের নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের বিধান থাকলেও স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের কোন বিধান নেই।

উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষত চাকরি, জমি বন্দোবস্তী বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ও অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দাগণ চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাদি হতে বরাবরই বঞ্চিত হচ্ছে এবং অউপজাতীয় অস্থায়ী ব্যক্তিগণ স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে চাকরিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা-জমির মালিকানাস্বত্ব লাভ করে চলেছে।

স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন

এই খন্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর বিগত ২০০০ ও ২০০৭-০৮ সালে প্রণীত ভোটার তালিকায় বাংলাদেশের সাধারণ ভোটার বিধিমালা অনুসারে বহিরাগতদেরও তালিকাভুক্ত করা হয়। অতি সম্প্রতি গত ১০ মার্চ ২০১২ থেকে শুরু হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি চলার সময়ও বহিরাগতদের ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়।

অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮নং ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সংশোধন (২০০০ সালের ৩৩, ৩৪ ও ৩৫নং আইন) করা হয়। প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আজ অবধি তা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি। বিগত ২০০০ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ভোটার তালিকা বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের দাবির মুখে উক্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আইন মন্ত্রণালয়ও ভেটিং প্রদান করে। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে এক্ষেত্রে কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পূর্বের মতো ২০০৭-০৮ সালে প্রণীত তিন পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়িসহ বান্দরবান পার্বত্য জেলায় নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, আলিকদম ও সদর উপজেলায় ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছে। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে গত ১০ মার্চ ২০১২ থেকে শুরু হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় এবং ২০১৪ সালে হালনাগাদের সময়ও প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন দলের সহায়তায় এসব উপজেলায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়।

পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ

এই খন্ডের ১৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসেবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এই ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হচ্ছে না।

এই খন্ডের ১৪ নং ধারার (ক) উপ-ধারায় বলা আছে যে, এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। (খ) নং উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখতে হবে। (গ) নং উপ-ধারায় আরো উল্লেখ আছে যে, এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে। এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না।

এ প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিরঙ্কুশভাবে অস্থানীয় ও অউপজাতীয়। তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী মনোভাবের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে বিরোধিতা করে চলেছে।

বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে তিন পার্বত্য জেলায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে বহিরাগত লোকদের নিয়োগ দিয়ে চলেছে।

উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন কার্যক্রম

এই খন্ডের ১৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।

১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন ১৯৯৮ প্রণয়নকালে এই ধারা যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উক্ত ধারা নিম্নোক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

"(২ক) ধারা ২৩ (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে পরিষদ এই ধারার উপধারা (১) এর আওতায় নিজস্ব তহবিল হইতে বা সরকার প্রদত্ত অর্থ হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।"

"(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।"

উল্লেখিত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য বিগত সরকারের নিকট বার বার দাবি করা হয়। অবশেষে ২০০০ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১নং আইন দ্বারা কেবলমাত্র প্রথমোক্ত (২ক) উপধারা চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত (৪) উপধারা সংশোধন করা হয়নি।

পার্বত্য জেলা পুলিশ এবং আইন-শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান

এই খন্ডের ২৪নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত করা ও পরিষদ তাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পুলিশবাহিনী গঠিত হয়নি। অপরদিকে পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশবাহিনীর বদলি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে।

অপরদিকে এই খন্ডের ৩৩(ক) ধারায় "পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান" এবং ৩৪(খ) ধারায় "পুলিশ (স্থানীয়)" পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরের বিধান রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ১৯৯৮ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনেও এই বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত বিষয়াদি এখনো জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ আইনগতভাবে তিন পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এ সকল পরিষদসমূহকে উপেক্ষা করে অপারেশন উত্তরণের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। এখনো পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সভা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে আহ্বান না করে ডেপুটি কমিশনারদের মাধ্যমে আহ্বান করা হয়। গত ৭ অক্টোবর ২০১২ খাগড়াছড়ি সফরকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ব্যতীত তিন পার্বত্য জেলায় র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) এর একটি ইউনিট গঠন করা হবে মর্মে ঘোষণা দেন (আমাদের সময়, ৮ অক্টোবর ২০১২)। এভাবে সরকার স্বয়ং পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন লঙ্ঘন করে চলেছে। এর ফলে পার্বত্য জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ে বিঘ্ন ঘটছে। ফলত পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উত্তরোত্তর অবনতি ঘটছে।

ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জেলা পরিষদের এখতিয়ার

এই খন্ডের ২৬নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর না করা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করার বিধান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এই খন্ডের ৩৪(ক) ধারা মোতাবেক 'ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা' পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়। কিন্তু আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। অপরদিকে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসরণে ডেপুটি কমিশনারগণ নামজারি, অধিগ্রহণ, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ এবং সেনা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে।

বহিরাগতদের ইজারা ও জবরদখল: পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে রাবার প্লান্টেশন, বন বাগান, ফলবাগানসহ হর্টিকালচারের নামে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট দীর্ঘমেয়াদি ভূমি লীজ দেওয়া হয়ে আসছে। লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে। লীজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় ভূমিও রয়েছে। এর ফলে শত শত জুম্ম অধিবাসী তাদের জুম ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সমতল জেলার (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগ) অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর বিপরীতে প্লটপ্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। নিম্নের সারণীতে তা দেখানো গেল-

ক্রঃ	উপজেলার নাম	রাবার প্লান্টেশন		হর্টিকালচার প্লট		মোট	
		প্লট সংখ্যা	জমি (একর)	প্লট সংখ্যা	জমি (একর)	প্লট সংখ্যা	জমি (একর)
১.	বান্দরবান সদর	৯১	২,২৭৫	১১৯	২,৮৫৫	২১০	৫,১৩০
২.	লামা	৮৩৫	২০,৮৭৫	১৭৭	৪,৫০০	১০১২	২৫,৩৭৫
৩.	আলিকদম	১৯৪	৪,৮৪৭	৬২	১,৫৫০	২৫৬	৬,৩৯৭
৪.	নাইক্ষ্যংছড়ি	১১২	২,৮০০	১৫	৩৭৫	১২৭	৩,১৭৫
মোট ৪টি উপজেলায়		১,২৩২	৩১,৭৯৭	৩৭৩	৯,২৮০	১,৬০৫	৪০,০৭৭

এছাড়া সামরিক ও সিভিল প্রশাসনের মদদে ও সহায়তায় বহিরাগত ব্যবসায়ী/প্রভাবশালী ব্যক্তি/ভূমিগ্রাসীদের উদ্যোগে ভূমি জবরদখল চলছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, নাইক্ষ্যংছড়িতে ২১টি চাক পরিবারকে উচ্ছেদ করে বহিরাগত প্রভাবশালী কর্তৃক তাদের জায়গা-জমি জবরদখল ও কামিছড়া মৌজায় প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদ কর্তৃক ব্যাপক জুম ভূমি দখল; ত্রাস সৃষ্টি করে উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে লামায় জুম্ম গ্রামবাসীর উপর বহিরাগত ভূমিদখলদারদের হামলা এবং লামা উপজেলার লুলেইন মৌজার ২৫০টি ম্রো পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি; লামায় জনৈক লাদেন গ্রুপ কর্তৃক ফাস্যাখালি ইউনিয়নের ৭৫টি ম্রো, ত্রিপুরা, মারমা ও স্থায়ী বাঙালি পরিবার উচ্ছেদ করে ১৭৫ একর জায়গা জবরদখল এবং আরো ২২১টি পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি; মুজিবুল হক গং কর্তৃক মারমা গ্রামবাসীর উপর হামলা চালিয়ে লামা উপজেলার রূপসী ইউনিয়নে প্রায় ৫০০ একর জায়গা দখলের অপচেষ্টা; রোয়াংছড়ি উপজেলায় বহিরাগত বাঙালি কর্তৃক ৩৩টি মারমা পরিবারের রেকর্ডীয় জমি জালিয়াতির মাধ্যমে বন্দোবস্তকরণ ও জবরদখলের অপচেষ্টা; আলিকদম উপজেলায় বদিউল আলম নামে জনৈক প্রভাবশালী কর্তৃক ম্রো, ত্রিপুরা ও মারমা পরিবারের প্রায় ১,০০০ একর রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জমি জবরদখল ইত্যাদি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যা রাষ্ট্রযন্ত্রের মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখলের ক্ষেত্রে মাৎস্যন্যায়ের অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে।

সশস্ত্রবাহিনীর ভূমি দখল: সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে হাজার হাজার একর জমি সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই অধিগ্রহণের জন্য সশস্ত্র বাহিনী তথা সরকার পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম অধিবাসীরা নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে এবং তাদের চিরায়ত জুম ভূমি হারিয়ে তাদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। নিম্নে কেবলমাত্র বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো-

ক্রঃ	বিবরণ	জমি (একর)
১.	সুয়ালকে গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য অধিগ্রহণকৃত	১১,৪৪৫.৪৫
২.	সুয়ালক গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রক্রিয়াধীন	১৯,০০০.০০
৩.	রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণ	৯,৫৬০.০০
৪.	বান্দরবানে ব্রিগেড সদর দপ্তর সম্প্রসারণ চূড়ান্ত প্রক্রিয়াধীন	১৮১.০০
৫.	টংকাবতিতে ইকোপার্ক ও সেনাবাহিনীর পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন	৫,৫০০.০০
৬.	বান্দরবান-লামা বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন	২৬,০০০.০০
৭.	বিজিবি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার (রুমা উপজেলাধীন পলি মৌজা)	২৫.০০
৮.	দীঘিনালা বিজিবি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার	৪৫.০০
৯.	বান্দরবান সদরের হ্লাপাইক্ষ্যং মৌজায় বিজিবি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার	১৩.০০
১০.	মাটিরাঙ্গায় ওয়াসু মৌজায় বিজিবি ক্যাম্প	৮.০০
১১.	মাটিরাঙ্গায় পলাশপুর বিজিবি ক্যাম্প সম্প্রসারণ	১০০.০০
	মোট জমির পরিমাণ	৭১,৮৭৭.৪৫

রুমা সেনানিবাসের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের অংশ হিসেবে প্রস্তাবিত জায়গা-জমি থেকে ম্রো অধিবাসীসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের জোরপূর্বক উচ্ছেদের পাঁয়তারা চলছে। অপরদিকে রুমা উপজেলায় পলি মৌজাধীন থানা পাড়ায় বিজিবি ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য ২৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এই হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হলে থানা পাড়ায় ৪০ পরিবার, বড়শি পাড়ায় ১৫ পরিবার এবং উপর ওনীচের রুমাচর পাড়ায় ৫০ পরিবার মারমা উচ্ছেদ হয়ে পড়বে। খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন পলাশপুর বিজিবি ক্যাম্প সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১০০ একরের অধিক জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ভূমি সমস্যা সমাধান না করে এবং পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে সরকার বর্তমানে বিজিবি, সামরিক বাহিনী বা আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প সম্প্রসারণ, সেনাবাহিনীর তথাকথিত পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের নামে অবৈধভাবে ভূমি জবরদখল ও অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো দীঘিনালা

দীঘিনালার বাবুছড়া বিজিবির অধিগ্রহণের কবলে পড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্ছেদ হওয়া কয়েকজন জুম্ম।

উপজেলার বাবুছড়ায় ২১টি জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করে এবং একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দখল করে বিজিবির ব্যাটেলিয়ন সদর দপ্তর স্থাপনের উদ্যোগ এবং রুমা উপজেলার পাইন্দু মৌজা ও পলি মৌজার পাইন্দু পাড়া, চান্দু পাড়া ও চাইপো পাড়ার প্রায় ৫০০ মারমা পরিবারকে উচ্ছেদ করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপন, বান্দরবান সদর উপজেলার হ্লাপাইক্ষ্যং মৌজায় বিজিবি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের উদ্যোগ; যার মধ্যে বাবুছড়ায় জুম্ম গ্রামবাসী ও বিজিবি-পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা সারাদেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দু'টি গ্রামের ৬৫টি জুম্ম পরিবার উচ্ছেদ করে বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকের রুইলুই গ্রামে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন; রুমা উপজেলায় বম অধিবাসী উচ্ছেদ করে অনিন্দ্য পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন; বান্দরবান সদর উপজেলায় ডোলা ম্রো পাড়া (জীবন নগর), কাপ্রু পাড়া (নীলগিরি), চিম্বুক ষোল মাইল, ওয়াই জংশন (বারো মাইল) ও কেওক্রডং পাহাড়ে ৬০০ একর জায়গা দখল করে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বান্দরবানে হ্লাপাইক্ষ্যং মৌজার ক্রাইখ্যং পাড়ায় বিজিবির জায়গা দখলের প্রতিবাদ করছেন জুম্মরা (উপরে), নীচে দখলের কবলে শ্বশান ভূমি ।

রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা: সংরক্ষিত বনাঞ্চল গঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২৫ জুন ১৯৯০ থেকে ৩১ মে ১৯৯৮ তারিখের জারিকৃত বিভিন্ন গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২,১৮,০০০ (দুই লক্ষ আটার হাজার) একর জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলায় ২০টি মৌজার ৮৪,৫৪২.৪২ একর মৌজা ভূমি এবং বান্দরবান জেলায় রয়েছে ৭২,০০০ একর জমি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সংখ্যালঘু ও সুযোগ বঞ্চিত খিয়াং জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বংশপরম্পরায় জুমচাষ ও বসতি করে আসা জমিতে পরবাসী হয়ে পড়েছে। নিম্নে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলার তথ্যচিত্র তুলে ধরা হল-

ক্রঃ	উপজেলা	মৌজার সংখ্যা	জমি (একর)
১.	আলিকদম উপজেলা	৩টি	৫,৭৫৪.৯৮
২.	নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা	৩টি	৪,৮৪০.০০
৩.	লামা উপজেলা	৫টি	২,৭৮০.৯৯
৪.	বান্দরবান সদর উপজেলা	৫টি	১৫,৭৫০.০০
৫.	রোয়াংছড়ি উপজেলা	১০টি	৪৫,৯৫০.০০
৬.	রুমা উপজেলা	৫টি	১১,৫০০.০০
৭.	থানছি উপজেলা	৪টি	৭,৫০০.০০
মোট ৭টি উপজেলায় ৩৫টি মৌজায় জমির পরিমাণ			৯৪,০৬৬.৯৭
প্রজ্ঞাপন বহির্ভূত কিন্তু বন বিভাগের দখলে রয়েছে জমির পরিমাণ			২৩,৯৩৩.০৩
মোট বন বিভাগের আওতায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য দখলকৃত জমি			১,১৮,০০০.০০

অতি সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও জুম্মদের প্রথাগত ভূমি অধিকারকে লঙ্ঘন করে বনবিভাগ কর্তৃক বন আইন ১৯২৭-এর ২০ ধারার অধীনে রক্ষিত বন (রিজার্ভ ফরেস্ট) হিসেবে ঘোষিত রাঙ্গামাটি জেলার ২০টি মৌজার ৮৪,৫৪২.৪২ একর মৌজা ভূমি অধিগ্রহণের কাজ জোরদার করা হয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় উক্ত মৌজা ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে জানা গেছে।

তারই অংশ হিসেবে গত ৭ জুলাই ২০১৪ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার (রাজস্ব) ও ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান কর্তৃক ডেপুটি কমিশনারের কাছে এক প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বন আইনের ৯ ধারা মোতাবেক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ২০টি মৌজার হেডম্যানদের প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনভূমির বিষয়ে আপত্তির প্রেক্ষিতে বিশটি মৌজা যথাক্রমে ১। ১৩০নং বারুদগুলা মৌজা, ২। ১২৮নং বসন্ত মৌজা, ৩। ১২২নং কুতুবদিয়া মৌজা, ৪। ১৩১নং বল্লাছড়ি মৌজা, ৫। ১০৮নং মানিকছড়ি মৌজা, ৬। ৯৯নং ঘাগড়া মৌজা, ৭। ১২৭নং আটারকছড়া মৌজা, ৮। ৫৭নং উল্টাছড়ি মৌজা, ৯। ১২৩নং হেমন্ত মৌজা, ১০। ১০৯নং সাপছড়ি মৌজা, ১১। ১১১নং কুতুবছড়ি মৌজা, ১২। ১১০নং শুকুরছড়ি মৌজা, ১৩। ১২৫নং ফুলগাজী মৌজা, ১৪। ১২৯নং কাইন্দা মৌজা, ১৫। ৭৯নং কেঙ্গেলছড়ি মৌজা, ১৬। ৭৭নং তৈচাকমা মৌজা, ১৭। ৭০নং হাজাছড়ি মৌজা, ১৮। ৬৯নং ঘিলাছড়ি মৌজা, ১৯। ৬৯নং চৌধুরীছড়া মৌজা ও ২০। ৩নং লংগদু মৌজার হেডম্যানগণ ও বন বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গত ২৯ জুন ২০১৪ তারিখে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ৬ জুলাই ২০১৪ তারিখে রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর ও বন বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ ১১০নং শুকুরছড়ি মৌজা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনে শুকুরছড়ি মৌজায় প্রস্তাবিত সংরক্ষিত বনভূমির জন্য ৫০০ (পাঁচশত) একর জমির মধ্যে ৪৬টি পরিবার যথাযথ প্রক্রিয়ায় বন্দোবস্তী পেয়ে বসবাস করছেন এবং বাকি ৪২টি পরিবার বন্দোবস্তীর জন্য আবেদন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বসতভিটা ছাড়াও বিভিন্ন প্রজাতির বনজ ও ফলজ বাগান সৃজন করেছেন। উক্ত এলাকায় দখলমুক্ত কোন জমি নেই বলে

প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য মৌজার হেডম্যানরা জানিয়েছেন যে, তাদের মৌজাগুলিতেও দখলীয় কোন জমি নেই। কেউ যথাযথ প্রক্রিয়ায় বন্দোবস্তী নিয়ে এবং কেউ বন্দোবস্তীর জন্য আবেদন করে ফলজ ও বনজ বাগান সৃজনসহ বসতভিটা নির্মাণ করে অনেক পূর্ব থেকে বসবাস করে আসছেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করলে অনেক লোকজনকে উচ্ছেদ করতে হবে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে সমীচীন নয় বলে প্রতিবেদনে মতামত দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, সংরক্ষিত/রক্ষিত বন হিসেবে ঘোষিত জমির মধ্যে রয়েছে বন্দোবস্তীকৃত বসতভিটা এবং ফল ও বনবাগানের জমি, বন্দোবস্তীর প্রক্রিয়াধীন জমি, প্রথাগত আইনের আওতায় মালিকানাধীন জুম ভূমি ও ভোগদখলীয় জমিসহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বনবিভাগের জুম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জুমিয়া পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার আওতাধীনে পুনর্বাসিত লোকজনের জমি। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে প্রায় দুই লক্ষ পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসী তাদের স্ব স্ব জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে।

পরিষদের বিশেষ অধিকার

এই খন্ডের ২৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পরিষদ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাবে। অধিকন্তু ২৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার থাকবে। ৩২নং ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

এই ধারাসমূহ আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আইনের এই ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করা থেকে সরকার বিরত রয়েছে।

পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ ও উহাদের হস্তান্তর

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে হস্তান্তরিত বিভাগের কতিপয় প্রতিষ্ঠান/কর্ম চুক্তি স্বাক্ষরের পর হস্তান্তরিত হলেও কোন পূর্ণাঙ্গ বিষয়/বিভাগ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মোট ৩৩টি বিষয়ের (যেখানে ৬৮টি কর্ম বিদ্যমান) মধ্যে এযাবৎ মোট ১৭টি বিষয় ও বিষয়ের অংশবিশেষ পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তরিত ১৭টি বিষয়/বিভাগগুলোর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে ১১টি বিষয়, বিএনপি সরকারের আমলে ১টি (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর) এবং মহাজোট সরকারের বর্তমান মেয়াদে (৯ জানুয়ারি ২০১৪ এর পর থেকে) ৫টি বিষয় মোট ১৭টি বিষয় হস্তান্তরিত হয়েছে। এছাড়া চুক্তির পূর্বে হস্তান্তরিত বিষয়/বিভাগের অধীন ১০টি কর্ম/অফিস যেমন- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৭-২০০৮) ৩টি এবং মহাজোট সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) ৭টি কর্ম/অফিস- তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত হয়েছে। নিম্নে হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিষয়সমূহের তালিকা দেয়া গেল-

হস্তান্তরিত বিষয়, কর্ম ও অফিসসমূহের তালিকা

হস্তান্তরের কাল	হস্তান্তরিত বিষয়, কর্ম বা কার্যালয়
চুক্তি-পূর্ব সময়ে* (১৯৮৯-১৯৯৭)	১। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ; ২। স্বাস্থ্য বিভাগ- (ক) পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ; ৩। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ; ৪। শিল্প ও বাণিজ্য- (ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, (খ) বাজারফান্ড প্রশাসন ও (গ) টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; ৫। সমবায় বিভাগ; ৬। সমাজসেবা বিভাগ; ৭। মৎস্য বিভাগ ৮। প্রাণি সম্পদ বিভাগ; ৯। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; ১০। সংস্কৃতি- (ক) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, (খ) শিল্পকলা একাডেমী, (গ) পাবলিক লাইব্রেরি; ১১। ক্রীড়া বিভাগ- (ক) জেলা ক্রীড়া সংস্থা।
আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১)	কোন বিষয় হস্তান্তরিত হয়নি।
বিএনপি সরকারের আমলে* (২০০১-২০০৬)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদে), ২০০৬ সালে
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে** (২০০৭-২০০৮)	১। জেলা হর্টিকালচার সেন্টার ও নার্সারিসমূহ (কৃষি বিভাগের অধীন), ২০০৭ সালে; ২। প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় (কৃষি বিভাগের অধীন), ২০০৭ সালে; ৩। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি (স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন), ২০০৮ সালে।
মহাজোট সরকারের আমলে** (২০০৯-২০১৩)	১। রাঙ্গামাটি নার্সিং ইনস্টিটিউট (স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন), ১২ মে ২০০৯ তারিখে; ২। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে), ২৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে; ৩। টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট (শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের অধীন), ২০১১ তারিখে; ৪। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) (কৃষি বিভাগের অধীন), ৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে; ৫। তুলা উন্নয়ন বোর্ড (কৃষি বিভাগের অধীন), ৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে; ৬। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য বিভাগের অধীন), ৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে; ৭। রামগড় মৎস্য খামার (মৎস্য বিভাগের অধীন), ৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে; ৮। সরকারি শিশু সদন (সমাজসেবা বিভাগের অধীন), ৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে।
মহাজোট সরকারের আমলে* (২০১৪ হতে)	১। জুম চাষ (পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সংশোধনের মাধ্যমে); ২। মাধ্যমিক শিক্ষা , ২৬ মে ২০১৪ তারিখে (চুক্তির মাধ্যমে); ৩। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান, ৭ জুন ২০১৪ তারিখে (অফিসাদেশের মাধ্যমে); ৪। মহাজনী কারবার, ৭ জুন ২০১৪ তারিখে (অফিসাদেশের মাধ্যমে); ৫। পর্যটন (স্থানীয়), ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে (চুক্তির মাধ্যমে)।

* উল্লেখিত সময়ে হস্তান্তরিত কার্যাবলী হচ্ছে এক একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র বিষয়। ** উল্লেখিত সময়ে হস্তান্তরিত কার্যাবলী (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যতীত) হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে হস্তান্তরিত বিষয়/বিভাগের অধীন এক একটি স্বতন্ত্র দপ্তর।

উল্লেখ্য যে, মহাজোট সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) হস্তান্তরিত উল্লেখিত কর্ম/প্রতিষ্ঠানকে একেকটি স্বতন্ত্র বিষয়/বিভাগ হিসেবে গণ্য করে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ২৮টি করে এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ২৬টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়ে গেছে বলে সরকার দাবি করছে যা বিভ্রান্তিমূলক ও অসত্য।

উপরোক্ত বিভাগসমূহের কেবলমাত্র জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্ম ও বেতন-ভাতাদি জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী এখনো হস্তান্তর করা হয়নি। এছাড়া শিল্প ও বাণিজ্যের মধ্যে বাজারফান্ড প্রশাসন ও বিসিক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কেবল কর্ম ও বেতন-ভাতাদি হস্তান্তর করা হয়েছে।

সর্বশেষ ২৮ আগস্ট ২০১৪ পর্যটন (স্থানীয়) বিষয়টি হস্তান্তর করা হলেও পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত পর্যটন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোই কেবল তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন থাকবে। পর্যটন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত পর্যটন কেন্দ্র ও প্রকল্পগুলো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন করা হয়নি যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল চেতনার সাথে বিরোধাত্মক বলে বলা যায়। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ বিশেষ করে জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), বন ও পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এখনো হস্তান্তর করা হয়নি।

অহস্তান্তরিত বিষয়, কর্ম ও অফিসসমূহের তালিকা

নং	প্রথম তফশিল অনুসারে পরিষদের কার্যাবলী (ক্রমিক নম্বরসহ)
১	১।* জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।
২	২। জেলায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।
৩	৩। শিক্ষা বিভাগের অধীন- *(ট) বৃত্তিমূলক শিক্ষা; *(ঠ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা;
৪	৬। কৃষি ও বন- *(খ) সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
৫	১৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।
৬	১৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।
৭	১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।
৮	১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৯	১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

নং	প্রথম তফশিল অনুসারে পরিষদের কার্যাবলী (ক্রমিক নম্বরসহ)
১০	১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।
১১	১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজকরণ।
১২	২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রণয়ন।
১৩	২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৪	২২।* পুলিশ (স্থানীয়)।
১৫	২৩।* উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার
১৬	২৪।* ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
১৭	২৫।* কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
১৮	২৬।* পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
১৯	২৯।* পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
২০	৩০।* স্থানীয় শিল্প বানিজ্যের লাইসেন্স প্রদান।

* পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে অন্তর্ভূক্ত যা ১৯৯৮ সনের ৯নং আইন দ্বারা সংযোজিত হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ১-৩ জুলাই ২০১২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ৩০ আগস্ট ২০১২ এর মধ্যে অহস্তান্তরিত সকল বিষয় হস্তান্তরের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক আজ অবধি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন- জেলার আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ (স্থানীয়), বন ও পরিবেশ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কোন বিষয় হস্তান্তর হয়নি বা কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির এই খন্ডের ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে, পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে। এই ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংক্রান্ত বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ-

১। ১৯৯৮ সালের ৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণীত হয়েছে।

২। ১৯৯৯ সালের ১২ মে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ২৭ মে অভিষেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের যাত্রা শুরু হয়।

৩। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।

৪। ২০১৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু উক্ত কার্যবিধিমালা প্রণয়নে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অনেক সুপারিশ ও মতামত উপেক্ষা করে। ফলে উক্ত কার্যবিধিমালায় আঞ্চলিক পরিষদ আইনের সাথে কয়েকটি গুরুতর সাংঘর্ষিক ও বিরোধাত্মক বিধান রয়েছে।

৫। "পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ প্রধান কার্যালয়, বাসভবন ও এতদসংশ্লিষ্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ শীর্ষক" প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অবকাঠামো গড়ে উঠেনি।

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ইহার উপর অর্পিত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও সম্পাদন করতে পারছে না।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ হচ্ছে-

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কার্যবিধিমালা সংশোধন সংক্রান্ত;

(খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ১৯৯৯ সংশোধন সংক্রান্ত;

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের বিশেষ তহবিল প্রবিধানমালা সংক্রান্ত;

(ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধানমালা সংশোধন সংক্রান্ত;

(ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর উপর সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত;

(চ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহের ধারা ১৬(ক)-এর উপ-ধারা ২-এর সংশোধন সংক্রান্ত;

(ছ) পুনর্বহালকৃত উপজাতীয় কর্মচারী (বিশেষ সুবিধাদি) বিধিমালা ২০১৪ সংক্রান্ত;

(জ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনসমূহ যথাযথভাবে কার্যকরকরণার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য বিভিন্ন আইন বা বিধানাবলী সংশোধন সংক্রান্ত।

পার্বত্য জেলা পরিষদের বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়

এই খন্ডের ৯নং ধারার (ক) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় এবং অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে কার্যকরকরণের বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না। সরকারের অসদিচ্ছার কারণে ও ক্ষমতাসীন দলের দলীয়করণ নীতির ফলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদকে যথাযথভাবে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রয়েছে।

বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক শিক্ষকসহ বিভিন্ন বিভাগে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করার পরিবর্তে উপেক্ষা করে চলেছে। বিশেষ করে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়োগ কমিটিতে আঞ্চলিক পরিষদের কোন প্রতিনিধি রাখা হয় না।

বিগত ২০০৫ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম, বহিরাগত লোকদেরকে নিয়োগ, সংরক্ষিত কোটা অনুসরণ না করা ইত্যাদি বিষয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের আপত্তির মুখে জনস্বার্থে আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে তদন্ত করার উদ্যোগ নেয়ার ক্ষেত্রে বান্দরবান জেলা পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদকে এ বিষয়ে সহযোগিতা ও তথ্য প্রদানে বিরত থাকেন। অপরদিকে পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন বিষয়ের উপর তদন্ত বা তত্ত্বাবধান করার কোন এখতিয়ার

আঞ্চলিক পরিষদের নেই বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকেও এ সময় একটি আইন পরিপন্থী নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ আঞ্চলিক পরিষদকে বরাবরই উপেক্ষা করে চলেছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির কোন নথিপত্রের অনুলিপি আঞ্চলিক পরিষদকে দেওয়া হয় না বললেই চলে। ফলত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় বিশেষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়

এই খন্ডের ৯নং ধারার (খ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সকল পৌরসভার নেতিবাচক ভূমিকার কারণে এক্ষেত্রে পরিষদের আইন কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই পৌরসভাসমূহও আঞ্চলিক পরিষদকে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগে অসহযোগিতা ও বিরোধিতা করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, ২০০০ সালে রাঙ্গামাটি পৌরসভায় কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ উঠে। আঞ্চলিক পরিষদ থেকে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া হলে রাঙ্গামাটি পৌরসভা কর্তৃপক্ষ তা অগ্রাহ্য করে। বিষয়টি সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে এসব অসঙ্গতি দূর করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ আইন, পৌরসভা আইন ও উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হলেও সরকার এখনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান

এই খন্ডের ৯নং ধারার (গ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের বিধান আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ থেকে ১০ এপ্রিল ২০০১ সালে তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করবে মর্মে পরিপত্র জারি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপার, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন পার্বত্য জেলা ও থানা পর্যায়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। বিশেষ করে একটি কায়েমি স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মহলের চুক্তি বিরোধীতা থাকার কারণে এবং বিশেষত: উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আমলাতান্ত্রিকতা এবং অপারেশন উত্তরণ বলবৎ থাকার কারণে সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না।

গত ২৪-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু তিন পার্বত্য জেলায় সফরকালে আয়োজিত আইন-শৃঙ্খলা সভাগুলোও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে আহ্বান না করে ডেপুটি কমিশনারদের মাধ্যমে আহ্বান করা হয়। এমনকি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর উক্ত সফরের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আঞ্চলিক পরিষদকে পূর্বাহ্নে জানানো হয়নি। উক্ত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোনরূপ আলোচনা ব্যতীত তিন পার্বত্য জেলায় র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) নিয়োগ করা হবে বলে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ঘোষণা দেন। অনুরূপভাবে ৩১ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন থেগামুখে স্থলবন্দর স্থাপন বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সফরের সময়ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে অবহিত করা হয়নি।

গত ৫ মে ২০১০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত এক সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং এই চুক্তির অধীনে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন বিষয়ে পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করার জন্য একতরফাভাবে একটি তথাকথিত "স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ফোরাম" গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রমসহ এনজিও কার্যাবলী সমন্বয় সাধন

এই খন্ডের ৯নং ধারার (ঘ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওসমূহের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে পাশ কাটিয়ে পূর্বের ন্যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। এসব ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে।

পার্বত্যাঞ্চলের স্থানীয় এনজিওদের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন প্রদানের প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। এনজিওদের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীর (এনজিও নীতিমালা) পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত ধারাসমূহ সংশোধন না করে এবং আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রাধান্য না দিয়ে সমতল জেলাসমূহের মত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ডেপুটি কমিশনারদের মাধ্যমে সমন্বয় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক পরিষদ সম্পৃক্ত থাকলেও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

গত ২০১০ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় আইন লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পরিবর্তে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের নিকট এনজিও কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার

এই খন্ডের ৯নং ধারার (ঙ) উপ-ধারা মোতাবেক উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। ফলত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার বিভাগের কার্যক্রমে নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৩৮ নং আইন) প্রণয়নের মাধ্যমে পূর্বের জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারকার্যের ক্ষমতা আইন, বিচার ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিচারিক কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তরের বিধান করা হয়। উক্ত আইনে সার্কেল চীফ ও হেডম্যান কর্তৃক প্রথাগত আইনে আদিবাসীদের বিচারকার্যের স্বীকৃতি রয়েছে। আদিবাসীদের প্রথাগত বিচার ব্যবস্থাকে সুস্পষ্টভাবে সদ্য প্রতিষ্ঠিত আদালতের এখতিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে। অধিকন্তু তিন পার্বত্য জেলায় প্রচলিত আইন, প্রথা ও পদ্ধতিগুলো আদালতে গ্রাহ্য হবে মর্মে এই আইনে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তিন পার্বত্য জেলায় নিয়োজিত বিচারকগণ অনেক সময় বিচারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, প্রথা ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন না বা সার্কেল চীফ-হেডম্যানদের রায় আমলে নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকার ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন সংসদে পাশ করে। উক্ত আইন প্রণয়নের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে কোন আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়নি এবং এমনকি আদিবাসীদের স্বতন্ত্র জাতিগত অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে আদিবাসীদেরকে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' নামে অভিহিত করা হয় যা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান

এই খন্ডের ৯নং ধারার (চ) উপ-ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যকর করা হচ্ছে না। চন্দ্রঘোনা রেয়ন ও কাগজের কলের পরিচালনা ও প্রশাসনের বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে অদ্যাবধি উপেক্ষা করা হচ্ছে।

সরকার গত ২০০৯ সালের মার্চ থেকে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলাধীন সিমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু করে। কিন্তু এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে কোন আলোচনা করা হয়নি।

অপরদিকে ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সীমান্ত বাণিজ্য চালু করার লক্ষ্যে যথাক্রমে রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন থেগামুখ এলাকায় এবং খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলায় রামগড় বাজার সংলগ্ন এলাকায় স্থল বন্দর স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে গত ৩১ সেপ্টেম্বর ২০১০ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ও থেগামুখ এলাকায় সফর করেন। এক্ষেত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপর সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান

এই খন্ডের ১০নং ধারা মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা এবং উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করার বিধান রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অবজ্ঞা করে চলেছে।

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) একজন জুম্ম এমপি'কে বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিলেও বিগত বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির উল্লেখিত বিধানকে লঙ্ঘন করে ২০০১ সালে খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত বিএনপি'র সংসদ সদস্য আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে (যিনি একজন সেটেলার) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে গত ২০০৭ সালের অক্টোবরে ২৪ পতাদিক ডিভিশনের জিওসি'কে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়েছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৪ মার্চ ২০০৯ বান্দরবান থেকে নির্বাচিত সাংসদ বীর বাহাদুর উশৈসিং'কে উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে পূর্বের মতো বর্তমানেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করে উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে ও প্রবল আপত্তি জানানো সত্ত্বেও ১ জুলাই ২০১৪ জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ পাশ করেছে। এই আইনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় রূপান্তর করা হয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার মূল প্রতিষ্ঠানসমূহ হচ্ছে জেলা পর্যায়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং অঞ্চল পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ প্রণয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে নি:সন্দেহে ক্ষুণ্ন করবে এবং প্রশাসন ও উন্নয়নে জটিলতা সৃষ্টি করবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২(ক)(গ) ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধানের বিধান রয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্পিত দায়িত্ব পালন করার বিধান থাকলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ বরাবরই উক্ত বিধান অবজ্ঞা করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও বোর্ডের মূল নির্বাহী পদে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে সরকারি আমলারাই মূলত সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন যাদের হাতে নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে। তার অর্থ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের মূল দায়িত্ব সরকারি আমলাদের হাতে থেকে যাচ্ছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামে গণমুখী ও সুষম উন্নয়নে তথা পার্বত্য জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থায় চরমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও অন্যান্য আইনের অসঙ্গতি দূরীকরণ

এই খন্ডের ১১নং ধারায় বর্ণিত আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের অসংগতি দুরীকরণ বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির কার্যকারিতা বিষয়ে ২৯/১০/১৯৯০ জারীকৃত স্মারক বাতিল করে চুক্তির আওতায় প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক আইন ১৯৯৮ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (সংশোধন)সহ অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যকর হবে মর্মে নতুন স্মারক জারি করার প্রস্তাব করা হলেও সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে ১৯৯০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে দোহাই দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৯৮ সালে সংশোধিত) এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করে তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পূর্বের ন্যায় সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও ইজারা প্রদান, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এনজিও কার্যক্রম তত্ত্বাবধানসহ জেলার সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছেন। ফলত পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ও পরিবেশ, সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ

এই খন্ডের ১২নং ধারা মোতাবেক পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ১৯৯৯ সনের মে মাসে অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিধি প্রবিধান প্রণীত না হওয়ার কারণে পরিষদ অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে। অপরদিকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ার ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের ভোটে আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন প্রণয়ন

এই খন্ডের ১৩নং ধারা মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ করে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার বিধান পরিষদের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনের এই ধারা অনুসরণ করা হচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আইন সংশোধন ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার পরামর্শ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এছাড়া পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও পাহাড়ি জনগণের কল্যাণের

পথে বিরূপ ফল হতে পারে এরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট সুপারিশ করা হলেও সরকার কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

এনজিওদের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালীবিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধানাবলী সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হলেও সরকার আজ অবধি কোন চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বনজদ্রব্য চলাচল বিধিমালা ১৯৭৩, শিক্ষা নীতিমালা এবং পানি সম্পদ আইন ২০০৯ এর উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মতামত সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকার যথাযথ কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২০১০ সালে শুরু হওয়া বাংলাদেশ বন্যপ্রাণি আইন প্রণয়ন এবং বন আইন সংশোধনের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮, স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ ও বাংলাদেশ বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ আইন ২০১২ প্রণয়নের সময় সরকারের তরফ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। তবে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়নের সময় আঞ্চলিক পরিষদের কতিপয় প্রস্তাব শিক্ষানীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়নের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত নেয়া হয়নি। অধিকন্তু আঞ্চলিক পরিষদের মতামত ও পরামর্শকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন ২০১৪ প্রণয়ন করছে যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর সরাসরি লঙ্ঘন।

(ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ এই খন্ডে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ে একমত হয়েছেন। এই খন্ডে বর্ণিত বিষয়াবলী বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা একনজরে নিম্নরূপ-

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে উপজাতীয় শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তাদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি বাস্তবায়ন হলেও অধিকাংশ জুম্ম শরণার্থীর জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি।

২। আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) টাস্কফোর্সের তৎকালীন চেয়ারম্যান দীপঙ্কর তালুকদারের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করা হয়। কিন্তু আজ অবধি তাদেরকে পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি লঙ্ঘন করে সেটেলার বাঙালিদেরও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে চরম জটিলতা সৃষ্টি হয়ে আছে।

৩। ভূমিহীন জুম্মদেরকে ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান করা হয়নি।

৪। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে আজ অবধি পর পর পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ দিয়েছে। সর্বশেষ গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ার-উল হককে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

৫। তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১" প্রণীত হয়। কিন্তু উক্ত আইনে চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ২৩টি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয় যা পরবর্তীতে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত করে ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে উত্থাপনের জন্য বিল আকারে গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ৪র্থ ও ৫ম সভায় এবং আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় উক্ত ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গত ১৬ জুন ২০১৩ এ আইনের সংশোধনী সংক্রান্ত বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। এরপর মতামতের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরিত হলে আজ অবধি বিলটি সংসদীয় কমিটিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধিত না হওয়ার কারণে অতি সম্প্রতি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হলেও ভূমি কমিশন অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে।

৬। রাবার চাষ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে অস্থানীয়দের নিকট বরাদ্দকৃত ভূমি ইজারা এখনো সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়নি। ২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বান্দরবান জেলায় ৫৯৩টি প্লট বাতিল করার সিদ্ধান্ত হলেও পরবর্তীতে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে উক্ত বাতিলকৃত প্লটগুলো অধিকাংশই পুনর্বহাল করা হয়। পক্ষান্তরে চুক্তির পরও ডেপুটি কমিশনারগণ অবৈধভাবে ইজারা প্রদান করে চলেছেন। গত ১৩ মার্চ ২০১৪ বাতিলকৃত ৯টি প্লটের ইজারাদাররা পুনর্বহালের জন্য হাই কোর্টে রিট দায়ের করেছেন।

৭। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেছে। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। প্রত্যেকটি সরকার আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আসছে। এছাড়া আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের গৃহীত বাজেট অনুসারে সরকার অর্থ বরাদ্দ করে না।

৮। পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য যথাযথ বৃত্তির ব্যবস্থা নেই।

৯। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পৃষ্টপোষকতার ক্ষেত্রে তেমন কোন পদক্ষেপ নেই।

১০। জনসংহতি সমিতির সদস্যদের যথাযথভাবে গোলাবারুদ ও অস্ত্র জমাদান সম্পন্ন হয়েছে।

১১। জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলাগুলোর মধ্যে জেলা মামলা প্রত্যাহার কমিটি কর্তৃক ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে; কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত অনুসারে আজ অবধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মামলা প্রত্যাহারের গেজেট প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া সাজাপ্রাপ্ত মামলা ও সামরিক আদালতের মামলাগুলিও অপ্রত্যাহৃত অবস্থায় রয়ে গেছে।

১২। সরকার কর্তৃক জনসংহতি সমিতির ১৯৬৭ জন সদস্যকে জনপ্রতি এককালীন ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ৬৪ জন সদস্যকে চাকরিতে পুনর্বহাল করেছে। ৬৮৫ জনকে পুলিশবাহিনীতে ভর্তি করেছে। কিন্তু অপরাপর সদস্যদেরকে এখনো পর্যন্ত তাদের ঋণ মওকুফ ও দাখিলকৃত আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি।

১৩। পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে তৎকালীন আওয়ামী লীগের আমলে (১৯৯৬-২০০১) মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের দলিলপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়েছে। কিন্তু সরকার পক্ষ দাবি করছে এযাবৎ ২০০টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহৃত হয়েছে তার কোন দলিলপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। অপরদিকে ২০০১ সালে 'অপারেশন দাবানল'-এর পরিবর্তে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাকর্তৃত্ব বলবৎ এবং সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হয়েছে। মহাজোট সরকারের আমলে ২০০৯ সালে একটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাহারের কোন দলিলপত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নিকট প্রেরণ করা হয়নি। তবে প্রত্যাহৃত কতিপয় ক্যাম্পে আবার এপিবিএন মোতায়েন করা হয়েছে।

১৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল প্রকার চাকরিতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকরিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনো বহিরাগতরা কর্মরত রয়েছে।

১৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়েছে এবং ১৫ জুলাই ১৯৯৮ মন্ত্রণালয়ের Rules of Business-এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বরাবরই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

চুক্তির 'ঘ' খন্ডে বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১নং ধারা অনুযায়ী এবং সরকার ও শরণার্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি মোতাবেক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে জুম্ম শরণার্থীরা প্রত্যাবর্তন করে। টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে প্রত্যাগত শরণার্থীদের অধিকাংশ অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাদি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের জমি ও ভিটেমাটি ফেরৎ দেওয়া হয়নি। তাদের জায়গা জমি ও গ্রাম এখনো সেটেলারদের দখলে থাকায় তাদের পুনর্বাসন এখনো যথাযথভাবে হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

মোট প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী সংখ্যা (৬৪,৬০৯ জন)	১২,২২২ পরিবার
ধান্যজমি, বাগান-বাগিচা ও বাস্তুভিটা ফেরৎ পায়নি	৯,৭৮০ পরিবার
প্রত্যাগত শরণার্থীদের মধ্যে হালের গরুর টাকা পায়নি	৮৯০ পরিবার
স্থানান্তরিত বিদ্যালয় পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি	৬টি বিদ্যালয়
স্থানান্তরিত বাজার পূর্ববর্তী স্থানে স্থাপন করা হয়নি ও শরণার্থীদের জমিতে নতুন বাজার স্থাপন করা হয়েছে	৫টি বাজার
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির	৭টি মন্দির
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত শরণার্থীদের গ্রাম	৪০টি
ঋণ মওকুফ করা হয়নি এমন শরণার্থীর সংখ্যা	৬৪২ জনের অধিক

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালে দীঘিনালার ট্রানজিট ক্যাম্পে (আবাসিক বিদ্যালয়) অবস্থানরত ২৬ পরিবার জুম্ম শরণার্থী, যাদের জমির উপর বোয়ালখালী বাজার স্থাপনের ফলে এখনো নিজেদের বসতভিটায় বসতি করতে পারেনি, তাদেরকে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হয়। তারা এতদিন নিজেদের জমি ও বসতভিটা ফেরত পাওয়ার দাবি করে আসছিল।

চারদলীয় জোট সরকার ২০০৩ সালে জুম্ম শরণার্থীদের রেশন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পরবর্তীতে জুম্ম শরণার্থীদের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মুখে ১৩ অক্টোবর ২০০৩ সরকার শরণার্থীদের রেশন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মাঝখানে এক বছর ধরে মাত্র অর্ধেক রেশন দেয়। এক বছরের উক্ত বকেয়া অর্ধেক রেশন আজও শরণার্থীরা পায়নি। বর্তমানে জুম্ম শরণার্থীদের পূর্বের ন্যায় রেশন দেওয়া হচ্ছে।

আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১ ও ২নং ধারা মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পরিচিহ্নিত করে টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান থাকলেও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের এখনো পুনর্বাসন করা হয়নি। পূর্বের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) দীপঙ্কর তালুকদারকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। চুক্তিতে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা বুঝানো হয়ে থাকলেও সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বসতিদানকারী সেটেলার বাঙালিদেরকেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী এই উদ্যোগের প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদ্বয় টাস্কফোর্সের নবম সভা চলাকালে ওয়াকআউট করেন। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে দীপঙ্কর তালুকদারের সভাপতিত্বে ১৫ মে ২০০০ অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্সের অবৈধ একাদশ সভায় একতরফাভাবে ৯০,২০৮ উপজাতীয় পরিবার এবং ৩৮,১৫৬ অউপজাতীয় সেটেলার পরিবারকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করা হয়। অবশেষে পার্বত্যবাসীর প্রবল প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম প্রায় অচল হয়ে পড়ে।

১৯ জুলাই ১৯৯৮ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ কার্যাদি বিভাগ থেকে সেটেলার বাঙালিদেরকে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচনা করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য যে পত্র টাস্ক ফোর্সকে দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহারের জন্য গত ২৪ অক্টোবর ২০১০ জনসংহতি সমিতির তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আজ অবধি এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

প্যাকেজ সুবিধা ঃ

১) প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এককালীন অনুদান বাবদ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

২) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে অস্ত্রবিরতির পূর্বদিন পর্যন্ত (১০-৮-৯২) যে সকল উদ্বাস্তু পরিবারের -

(ক) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ রয়েছে তা সুদসহ মওকুফ করা যেতে পারে।

(খ) ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার উপরের ঋণসমূহের কেবলমাত্র সুদ মওকুফ করা যেতে পারে।

৩) উদ্বাস্তুদের নিজ মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

৪) আয়বর্ধন কর্মসূচির জন্য একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত বরাদ্দ হতে তফশিলি ব্যাংকের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এর আগে ২০০০ সালের জুন মাসে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়কের নিকট স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলার সমস্যা নিরসন বিষয়ে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ উত্থাপন করা হয়-

১. (ক) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদেরকে আভ্যন্তরীণ অউপজাতীয় উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাতিল করা। এতদুদ্দেশ্যে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ হতে টাস্ক ফোর্সের নিকট প্রেরিত ১৯-৭-৯৮ তারিখের আদেশপত্রের অউপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়টি প্রত্যাহার করা।

(খ) বহিরাগত অউপজাতীয় সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করা এবং উক্ত প্রক্রিয়া শুরু করা।

২. (ক) আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

(খ) বিভিন্ন থানায় বাদ পড়ে যাওয়া আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩. টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত ৪টি প্যাকেজ সুবিধার পরিবর্তে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক পেশকৃত সুযোগ-সুবিধাদির ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য টাস্ক ফোর্স কর্তৃক প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা অত্যন্ত কম। উক্ত ধরনের সুবিধা দিয়ে কোন অবস্থাতেই উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের প্রকৃত পুনর্বাসন সম্ভব হতে পারে না। উক্ত প্রস্তাবিত প্যাকেজ সুবিধা জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক টাস্ক ফোর্সের দ্বিতীয় সভায় পেশকৃত প্রস্তাবিত সুযোগ-সুবিধাদি হতে অনেক কম। পেশকৃত উক্ত সুযোগ-সুবিধাদি হলো-

(ক) বাস্তুভিটাসহ জমিজমা ফেরৎ প্রদান করা;

(খ) ঘরবাড়ি নির্মাণ, ঢেউটিন ও অন্যান্য সামগ্রীসহ নগদ ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা;

(গ) এককালীন অর্থ সাহায্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করা;

(ঘ) এক বৎসরের রেশনসহ তেল, ডাল ও লবণ প্রদান করা;

(ঙ) ভূমিহীনদের ভূমি প্রদান করা;

(চ) পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা;

(জ) চাকরিতে পুনর্বহাল করা ও জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা;

(ঝ) হেডম্যানদের পুনর্বহাল করা;

(ঞ) ঋণ মওকুফ করা;

(ট) মামলা প্রত্যাহার করা।

বিগত খালেদা জিয়া নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২৯ অক্টোবর ২০০৪ সমীরণ দেওয়ানকে টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত হওয়ার পর এ যাবৎ ২০০৪ সালের ২২ এপ্রিল, ২৭ মে, ২৫ জুলাই এবং ২১ নভেম্বর এই চার বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিষয়ে মৌলিক কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। পূর্ববর্তী টাস্ক ফোর্সের সূত্র ধরে পূর্বের মতোই সরকার পক্ষ সেটেলার বাঙালিদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু গণ্য করে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার পক্ষের এই প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান টাস্ক ফোর্সও পূর্বের মতো অচল হয়ে পড়েছে। ফলত আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে গত ৩ জুন ২০০৭ খাগড়াছড়ির সার্কিট হাউসে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পর পরই টাস্ক ফোর্সের সদস্য ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধি সন্তোষিত চাকমা বকুলকে সার্কিট হাউসের সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৩ মার্চ ২০০৯ খাগড়াছড়ি আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরাকে টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠিত হয়। টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠনের পর গত ৫ অক্টোবর ২০০৯ ও ২৭ জানুয়ারি ২০১০ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে এবং ২৬ জানুয়ারি ২০১১ ও ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে টাস্ক ফোর্সের মোট চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নতুন করে মহাজোট সরকার গঠনের পর গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে টাস্কফোর্সের ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভাগুলোতে মূলত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিচিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও প্রকৃত আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের অন্তর্ভুক্ত করা, ২০-দফা প্যাকেজ সুবিধা, টাস্ক ফোর্সের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত করা, টাস্ক ফোর্সের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং জনবল ও তহবিল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি কর্তৃক সেটেলার বাঙালিদের আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

ভূমিহীনদের ভূমি বন্দোবস্তী প্রদান সংক্রান্ত

এই খন্ডের ৩নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক ভূমিহীন বা দু' একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পরিবার প্রতি দু' একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান থাকলেও সরকার পক্ষ হতে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। বরঞ্চ ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের নামে চুক্তি লঙ্ঘন করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তিন পার্বত্য জেলায় আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

ভূমি কমিশন ও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি

এই খন্ডের ৪নং ধারায় বলা আছে যে, জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সে সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।

এই ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠিত হয়েছে। কিন্তু ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। এই ধারা অনুযায়ী এ যাবৎ নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে-

(১) ৩ জুন ১৯৯৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক চৌধুরীকে ল্যান্ড কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কার্যভার গ্রহণের আগে ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ মৃত্যুবরণ করেন।

(২) ৫ এপ্রিল ২০০০ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আব্দুল করিমকে চেয়ারম্যান পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি ১২ জুন ২০০০ কার্যভার গ্রহণ করেন। কার্যভার গ্রহণের পর তিনি একবার মাত্র খাগড়াছড়ি জেলায় সফরকরেন। তারপর তিনিও শারীরিক অসুস্থতার কারণে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর প্রায় দেড় বছর ধরে চেয়ারম্যান পদ শূণ্য থাকে।

(৩) বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে ২৯ নভেম্বর ২০০১ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাহমুদুর রহমানকে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। তিনিও ২০০৭ সালের নভেম্বরে মারা যান। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেনি।

(৪) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে ১৯ জুলাই ২০০৯ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৮ জুলাই ২০১২ তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এক বছরের অধিক কমিশনের চেয়ারম্যান পদ শূণ্য থাকে।

(৫) দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সরকার কর্তৃক গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ার-উল হককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আনোয়ার-উল হককে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারাগুলো সংশোধন না হওয়ার কারণে কমিশনের কাজ এখনো শুরু করা যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আশু জরুরি বিষয় হচ্ছে ২০০১ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সংশোধন করা। বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। উক্ত আইনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে বিরোধাত্মক ১৯টি বিষয় রয়েছে।

উক্ত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য ২০০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ হতে সুপারিশমালা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। উক্ত সুপারিশমালা বিবেচনার্থে বিএনপি নেতৃত্বাধীন তৎকালীন জোট সরকারের আমলে ১২ মার্চ ২০০২ তৎকালীন আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমদের সাথে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বাধীন পরিষদের এক প্রতিনিধিদলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ মোতাবেক ভূমি কমিশন আইনের সংশোধন করার ঐকমত্য হয়। তদনুসারে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ভেটিং হয়ে যাবার পর উক্ত ভূমি কমিশন আইন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত হয়। এরপর আর কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও এ বিষয়ে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি।

বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উক্ত বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য গত ৭ মে ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে সরকারের নিকট পুনরায় সুপারিশমালা প্রেরণ করা হয়। উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের উপর বিভিন্ন স্তরে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এখনো ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারাগুলো প্রথমে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় রয়েছে।

এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে যৌথভাবে যাচাইবাছাই পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত করে বিল আকারে মন্ত্রী সভা ও জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য গত ২০ জুন ২০১১ ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পাঠানো হলে ২২ জানুয়ারি ২০১২ ও ২৮ মে ২০১২ অনুষ্ঠিত চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম সভায়ও উক্ত ১৩ দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ

আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য যে, গত ২৭ মে ২০১৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' বিল মন্ত্রীসভায় উত্থাপিত হয়েছে এবং তারই আলোকে গত ৩ জুন ২০১৩ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে উক্ত বিল অনুমোদিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৬ জুন ২০১৩ উক্ত সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে এবং বিধি মোতাবেক মতামত চেয়ে উক্ত বিল ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত বিলে ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ১০টি সংশোধনী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকী ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে উত্থাপিত ১০টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে ২টি সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন যথাযথভাবে সংশোধনকল্পে উক্ত বিলের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ১৮ জুন ২০১৩ সরকারের নিকট পাঁচদফা সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়।

উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গত ১৬ জুলাই ২০১৩ জাতীয় সংসদের কেবিনেট সভাকক্ষে ভূমি কমিশন বিলের উপর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত করে, এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সংশোধনী দাবিনামাসমূহ পুনরায় উত্থাপন করা হয়। এরপর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত করে, যেখানে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ভূমি কমিশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধিতাকারী পার্বত্য যুব ফ্রন্ট, পার্বত্য নাগরিক পরিষদ, বাঙালি ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি ভূঁইফোড় সাম্প্রদায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ করা হয়। এরপর গত ৩ অক্টোবর ২০১৩ একবার ও গত ১১ নভেম্বর ২০১৩ আরেক বার সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দু'টি সভায় আলোচ্যসূচিতে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' বিলটি উল্লেখ থাকলেও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা না করে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি সংশোধনে সরকার কালক্ষেপণ ও ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছে এবং এরই অংশ হিসেবে সংসদীয় কমিটিতে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর গত ২৭ অক্টোবর ২০১৪ বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর উদ্যোগে ঢাকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধন বিষয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত বৈঠকে অচিরেই আরেকটি সভা আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ভূমি কমিশনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করার বিষয়টি এখনো চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরাজ করছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় ভূমি বিরোধ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিনিয়ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হচ্ছে এবং সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

ক্র:	সংশোধনীয় ধারাসমূহ	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিল	মতামত ও করণীয়
১	প্রস্তাবনার ৩য় প্যারা : "পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে;"	প্রস্তাবনার ৩য় দফা : "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে;	"পার্বত্য জেলা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য জনসংহতি সমিতি" শব্দগুলির পরিবর্তে "পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।	বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
২	ধারা ৩(২)(ঘ): "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ, পদাধিকার বলে;"	ধারা ৩(১)(ঘ): "সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;"	"সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফ বা তাহার পক্ষে সভায় সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতাসহ তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;"	বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
৩	ধারা ৬(১)(ক): "পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা।"	ধারা ৬(১)(ক): "পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমি-জমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হওয়া জায়গাজমি ও পাহাড়ের মালিকানাস্বত্ত্ব বাতিলকরণসহ সমস্ত ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা।"	"(ক) পুনর্বাসিত শরণার্থীদের ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ এবং অবৈধ বন্দোবস্ত ও বেদখল হওয়া ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুয়ায়ী নিষ্পত্তি করা;"	বিলে সংশোধনীগুলো যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। উপরন্তু "পদ্ধতি" শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে। ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে সংশোধন করতে হবে।
৪	ধারা ৬(১)(খ): "আবেদনে উল্লেখিত ভূমিতে আবেদনকারী, বা ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষের, স্বত্ব বা অন্যবিধ অধিকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী নির্ধারণ এবং দখল পুনর্বহাল;"	ধারা ৬(১)(খ): "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী" শব্দাবলীর স্থলে "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী" শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা।	বিলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।	১৩ দফা প্রস্তাব অনুসারে সংশোধন করতে হবে।

ক্রঃ	সংশোধনীয় ধারাসমূহ	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিল	মতামত ও করণীয়
৫	ধারা ৬(১)(গ): "পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন বর্হিভূতভাবে কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং উক্ত বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল: ।"	ধারা ৬(১)(গ): "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি বহির্ভুতভাবে ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি)সহ কোন ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান বা বেদখল করা হইয়া থাকিলে উহা বাতিলকরণ এবং বন্দোবস্তজনিত কারণে কোন বৈধ মালিক ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলে তাহার দখল পুনর্বহাল;" শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করা। এবং ধারা ৬(১)(গ)এর শর্তাংশ "তবে শর্ত থাকে যে, প্রযোজ্য আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।" শব্দাবলী বিলুপ্ত করা।	দফা (গ)-তে উল্লেখিত "আইন" শব্দটির পরিবর্তে "আইন ও রীতি" শব্দগুলি এবং "কোন ভূমি" শব্দগুলির পরিবর্তে "জলেভাসা (Fringe land) সহ যে কোন ভূমি" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।	বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ১। "বন্দোবস্ত প্রদান করা" শব্দগুলির পরে "বেদখল করা" এবং "উক্ত বন্দোবস্তজনিত" শব্দগুলির পর "বেদখলজনিত" শব্দ সংযোজন করা। ২। "পদ্ধতি" শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে। তাই "পদ্ধতি" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৩। শর্তাংশটি নিম্নরূপে সংশোধন করা- "তবে শর্ত থাকে যে, [পার্বত্য চট্টগ্রামে] প্রযোজ্য আইনের অধীনে [পদ্ধতিগতভাবে] অধিগ্রহণকৃত ভূমি এবং [১৯৪৬ সালে ও ইহার পূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুসারে] রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা'র [স্থাপনা], বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পকারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে [পদ্ধতিগতভাবে] রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য হইবে না।"

ক্র:	সংশোধনীয় ধারাসমূহ	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিল	মতামত ও করণীয়
৬	ধারা ৭(৩): "কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।"	ধারা ৭(৩): "কমিশনের কোন বৈঠকে কোরামের জন্য চেয়ারম্যান এবং অপর তিনজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং চেয়ারম্যান কমিশনের সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।"	বিলে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।	১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে সংশোধন করতে হবে।
৭	ধারা ৭(৪): "কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কোন বৈঠকে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিষ্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।"	ধারা ৭(৪): "কোন বৈঠকে বিবেচিত বিষয় অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা পরবর্তী যে কোন বৈঠকে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা যাইবে, তবে এইরূপ বিবেচনা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সকল সদস্যকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী বৈঠকে উপস্থিত সদস্যগণের কাহারও অনুপস্থিতির কারণে বিষয়টির নিষ্পত্তি বন্ধ থাকিবে না বা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অবৈধ হইবে না।"	"উপ-ধারা (৪) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ– তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বিবেচনা ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কমিশনের সকল সদস্যকে বৈঠকের পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।";	বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
৮	ধারা ৭(৫): "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ৬(১)-এ বর্ণিত বিষয়টিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"	ধারা ৭(৫): "চেয়ারম্যান উপস্থিত অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে ৬(১)-এ বর্ণিত বিষয়টিসহ উহার এখতিয়ারভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে সর্বসম্মতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে চেয়ারম্যানসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের গৃহীত সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;"	উপ-ধারা (৫)-এ উল্লেখিত "চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তই কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "চেয়ারম্যানসহ উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের গৃহীত সিদ্ধান্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।	বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক্রঃ	সংশোধনীয় ধারাসমূহ	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিল	মতামত ও করণীয়
৯	ধারা ৯ : কমিশনের আবেদন দাখিল।	ধারা ৯ : কমিশনের নিকট আবেদন দাখিল।	ধারা ৯ এর সংশোধন।– (ক) উপান্ত-টীকায় উল্লিখিত "কমিশনের আবেদন দাখিল" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিশনের নিকট আবেদন দাখিল" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে। (খ) বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসেবে পুন:সংখ্যায়িত হইবে এবং অত:পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা:– "(২) আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে যেকোন পর্যায়ে ন্যায় বিচারের স্বার্থে, কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে, আবেদনকারী তাঁহার আবেদন একবার সংশোধন করিতে পারিবেন।"	বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
১০	ধারা ১০ : নতুন উপ-ধারা (৪) সংযোজন করা।	১০(৩) ধারার পরে নতুন উপধারা সংযোজন: "(৪) কমিশন কর্তৃক আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে যে কোন সময়, ন্যায় বিচারের স্বার্থে, আবেদনকারী তাঁহার আবেদন সংশোধন করিতে পারিবেন।"	এই সংশোধনী প্রস্তাব ধারা ৯-এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।	বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
১১	ধারা ১৩ : নতুন উপ-ধারা (৩) সংযোজন করা।	১৩(২) ধারার পরে নতুন উপ-ধারা সংযোজন : "(৩) এই ধারার অধীন কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে।"	"(৩) এই ধারার অধীন কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পার্বত্য জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।"	বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক্রঃ	সংশোধনীয় ধারাসমূহ	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ	১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিল	মতামত ও করণীয়
১২	ধারা ১৮: "বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, এই আইন বলবৎ হইবার ছয় মাসের মধ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে।"	ধারা ১৮: "বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, এই আইন বলবৎ হইবার পর যথাশীঘ্র সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিবে।"	"এই আইন বলবৎ হইবার ছয় মাসের মধ্যে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।	বিলে আংশিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
১৩	নতুন ধারা ২১ সংযোজন করা।	"২১। কমিশনের কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্তকরণ।– কমিশন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত হইবে এবং এই আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা কার্যকর হইবে।"	বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।	১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে সংশোধন করতে হবে।

রাবার চাষ ও অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য বরাদ্দকৃত জমির ইজারা বাতিলকরণ

এই খন্ডের ৮নং ধারা মোতাবেক যে সকল অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা লীজ পাওয়ার পর দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেননি বা জমি সঠিক ব্যবহার করেননি সে সকল জমির ইজারা বাতিল করার বিধান থাকলেও আজ অবধি তা বাস্তবায়িত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও ভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনের মতে আশি ও নব্বই দশকে বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সমতল জেলার অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১,৮৭৭ প্লটের বিপরীতে প্রায় ৪৬,৭৫০ একর জমি ইজারা দেয়া হয়েছে। এসব বরাদ্দকৃত একটি প্লটও আজ অবধি বাতিল করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষত বান্দরবান জেলায় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক নিয়ম লঙ্ঘন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

গত ২০ জুলাই ও ১৮ আগস্ট ২০০৯ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সেসমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে বান্দরবান জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মৌজার হেডম্যান, জেলা কানুনগো, উপজেলার আমিন সমন্বয়ে বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় যেসব লীজ গ্রহীতাগণ বাগান সৃজন করে নাই তাদের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বাগান সৃজিত না করে চুক্তি পত্রের শর্ত লঙ্ঘিত করার কারণে ৫৯৩টি প্লট বাতিল করা হয় এবং লীজ বাতিলকৃত প্লট মালিকদের নিকট জেলা প্রশাসকের (রাজস্ব শাখা) কার্যালয় এর

স্মারক নং-জেপ্রবান/লীজ-১০৬০/ডি/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ২৯/০৯/২০০৯ রেভেন্যু ডেপুটি কালেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) পক্ষে, জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা কর্তৃক স্বাক্ষরিত নোটিশ প্রদান করে আলোচ্য ভূমি সরকারের দখলে আনা হয়।

কিন্তু অত্যন্ত দু:খজনক ও উদ্বেগজনক যে, বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন দুর্নীতির মাধ্যমে লীজ বাতিলের দু' মাসের মাথায় স্বারক নং- জেপ্রবান/লীজ মো:নং-১০৬০(ডি)/৮০-৮১/২০০৯ তারিখ ১৯/১১/২০০৯ মূলে বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করা হয়। অন্যদিকে অবশিষ্ট প্লট কাগজে কলমে বাতিল করা হলেও এখনো উক্ত ভূমি প্লট মালিকদের দখলে রয়েছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া, ভূমি কমিশন আইন সংশোধন না হওয়া, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া এবং পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী লীজ বাতিল না হওয়ার কারণে অস্থানীয় ও বহিরাগত বাঙালিরা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ও যোগসাজসে ইজারা ভূমির নামে হাজার হাজার একর ভূমি জবরদখল করে চলেছে এবং উক্ত জায়গা-জমি থেকে জুম্মদের চলে যেতে হুমকি দিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু এলাকায় ভাড়াটিয়া বহিরাগত বাঙালি শ্রমিকদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্ম গ্রামবাসীর উপর হামলাও চালিয়েছে। ফলত আদিবাসী জুম্মরা শংকিত ও উদ্বিগ্নাবস্থায় জীবন যাপন করছে। অতিশীঘ্রই ইজারা বাতিল না হলে এবং দখলদারদের উচ্ছেদ করা না হলে এতদাঞ্চলের পরিস্থিতি চরম সংকটের দিকে যাবে।

বহিরাগত ভূমিদস্যুদের উৎপাত, হয়রানি ও হুমকির মুখে বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের আলিক্ষ্যং মৌজার পাদুঝিরি চাক পাড়া নামে একটি আদিবাসী গ্রাম থেকে ২১টি আদিবাসী চাক পরিবার ২০১৩ সালের মার্চ মাসে তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। এসব উচ্ছেদ হওয়া চাক পরিবারসমূহ অধিকাংশই জুমচাষী। গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ভূমিদস্যু সেটেলার বাঙালি মুজিবুল হক মাস্টার (মুজিবুল লিডার) এর নেতৃত্বে ২০-৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের পলিঝিড়ি (পলিক্ষ্যং) এলাকায় জুম্মদের ভূমি জবরদখল করতে গেলে জুমে কর্মরত জুম্মদের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় ২ মহিলাসহ ৮ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয়। সন্ত্রাসীরা জুম্মদের জুমঘরও ভেঙে দেয়। উল্লেখ্য যে, ২৯৪ নং দড়দড়ি মৌজার পলিঝিড়ি এলাকায় উশৈহ্লা মারমাসহ হ্লাচাই পাড়াবাসীর বাগান ও জুম রয়েছে। ভূমিদস্যু মজিবুল হকের সন্ত্রাসী গ্রুপের লোকেরা এলাকায় ভূমি জোরপূর্বক দখল করে বাইরের কোম্পানীর হাতে তুলে দিত। বান্দরবান জেলার লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি ইত্যাদি উপজেলায় বহিরাগত ভূমিদস্যু, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও প্রভাবশালী মহল স্থানীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় জমি জবরদখল করে চলেছে।

এদিকে গত ১৩ মার্চ ২০১৪ বাতিলকৃত প্লটের ৯ জন ইজারাদারদের পক্ষে মোহাম্মদ বদিউল আলম নামে জনৈক ভূমিগ্রাসী বাতিলকৃত ইজারা পুনর্বহালের আবেদন জানিয়ে হাই কোর্টে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছে। বাতিলকৃত প্লটের ৯ জন ইজারাদাররা হলেন-

১. জকি আহাদ, পিতা নুর-আল-আহাদ, বাড়ি নং ৫, ব্লক নং ২৯/ক, পল্লবী, ঢাকা।
২. জিয়া আহাদ, পিতা নুর-আল-আহাদ, বাড়ি নং ৫, ব্লক নং ২৯/ক, পল্লবী, ঢাকা।
৩. ফাহিমা আহাদ, স্বামী জকি আহাদ, বাড়ি নং ৫, ব্লক নং ২৯/ক, পল্লবী, ঢাকা।
৪. এইচ জে আহাদ, স্বামী নুর-আল-আহাদ, বাড়ি নং ৫, ব্লক নং ২৯/ক, পল্লবী, ঢাকা।
৫. মুরাদ মোহাম্মদ তাজ, পিতা হজরত শাহ সুফি তাজ ইসলাম, বিশুরা দরবার আমানতলা, মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
৬. মিজ পপি, পিতা সিরাজউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ৪২/ক পিসি কালচার ও হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
৭. হোসনের জাহান আহাদ, স্বামী নুর-আল-আহাদ, বাড়ি নং ৫, ব্লক নং ২৯/ক, পল্লবী, ঢাকা।

৮. লামিয়া আহাদ, স্বামী জকি আহাদ, বাড়ি নং ৫, ব্লক নং ২৯/ক, পল্লবী, ঢাকা।
৯. রিহাদ, পিতা জাকিয়া আহাদ, ৪২/ক পিসি কালচার ও হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উক্ত ইজারাদাররা মোহাম্মদ বদিউল আলম পিতা আলহাজ্ব এম এ রশিদ, তার স্ত্রী সুরাইয়া আলম ও তার ছেলে মো: শাহজাদুল আলম প্রমুখ তিন ব্যক্তিকে পাওয়ার অব এর্টনী হিসেবে নিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে হাই কোর্টে রিট পিটিশন (পিটিশন নং ১৪৮২/২০১৪) দায়ের করেন। যাদের বিরুদ্ধে উক্ত পিটিশন দায়ের করা হয় তা হলেন- (১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়; (২) সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; (৩) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ; (৪) ডেপুটি কমিশনার, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; (৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আলিকদম উপজেলা; (৬) সহকারী কমিশনার (ভূমি), আলিকদম উপজেলা; (৭) হেডম্যান, ২৯১ নং তৈনফা মৌজা, আলিকদম। উক্ত রিট পিটিশনে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে পক্ষভুক্ত করা হয়নি।

উক্ত রিট পিটিশনের প্রেক্ষিতে হাই কোর্ট স্থগিতাদেশ জারি করে এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাতিলকৃত প্লটগুলো ইজারাদারদের দখলে থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। এর ফলে বর্তমানে ইজারাদারদের পক্ষে বদিউল আলম গং প্লটগুলোতে চারা রোপণ করছে এবং ইজারার অজুহাত দেখিয়ে প্লটগুলোর বাইরে অনেক জমি জবরদখল করে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দ

এই খন্ডের ৯নং ধারা মোতাবেক সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা ও এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা এবং এই অঞ্চলের পরিবেশ বিবেচনায় রেখে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগানোর বিধান থাকলেও সরকার কর্তৃক পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাযথ পদ্ধতিতে অর্থায়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান

এই খন্ডের ১০নং ধারা মোতাবেক চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখা, উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করা, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করার বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ রয়েছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) পাহাড়িদের কোটা সংরক্ষিত থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকারি কোন বৃত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অধিকন্তু ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উপজাতীয় কোটা'কে 'পার্বত্য কোটা' হিসেবে রূপান্তরিত করে সেটেলার বাঙালিদেরও উক্ত কোটায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের নিকট তিন পার্বত্য জেলার সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারী, মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষকদের আবাসন ও পাহাড়ি ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান কলেজে অধিকসংখ্যক বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স

চালুকরণসহ শিক্ষা খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করারও দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু জনমত উপেক্ষা করে এ বিষয়ে সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে একতরফাভাবে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে জটিলতর ও অনিশ্চিত করে তুলছে।

উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

এই খন্ডের ১১নং ধারা মোতাবেক আদিবাসী জুম্মদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মন্ত্রী-ভিআইপিদের নাচ-গান পরিবেশন করা এবং কিছু সংকলন প্রকাশ করার মধ্যেই সীমিত রয়েছে। পক্ষান্তরে জুম্মদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিকৃতি ও বিলুপ্তিকরণের ধারা অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানের আদিবাসী নাম পরিবর্তন করে বাঙালি বা ইসলামিকরণ অব্যাহত রয়েছে। পাঠ্য-পুস্তকে ইসলামী ধারার শিক্ষা গ্রহণে জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ্য-পুস্তকে যথাযথভাবে উল্লেখ নেই; যা উল্লেখ করা হয়েছে তা অত্যন্ত বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া সুকৌশলে জুম্মদেরকে ইসলামী কায়দায় নামের আগে 'বেগম'/'জনাব' লিখতে বা সম্বোধন করতে বাধ্য করা হয়।

জনসংহতি সমিতি সদস্যদের অস্ত্র জমাদান

এই খন্ডের ১৩নং ধারা মোতাবেক সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির তালিকাভুক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে পালনীয় সব কিছু যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সাধারণ ক্ষমা ও মামলা প্রত্যাহার

এই খন্ডের ১৪নং ধারায় নির্ধারিত তারিখে জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার কর্তৃক তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা এবং যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করার বিধান রয়েছে। ১৬নং ধারায় জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা ও জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করার বিধান রয়েছে।

জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমিতির কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার ও সাজা মওকুফ করার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৬ দফায় ২৫২৪ জনের বিরুদ্ধে আনীত ৮৩৯টি মামলার তালিকা সরকারের নিকট পেশ করা হয়। তন্মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে তিন পার্বত্য জেলায় গঠিত মামলা প্রত্যাহার সংক্রান্ত তিনটি জেলা কমিটি কর্তৃক যাচাইবাছাই করে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে আজ অবধি উক্ত সুপারিশ অনুসারে উক্ত

মামলাগুলো প্রত্যাহারের গেজেট জারি হয়নি। এছাড়া এখনো ১১৯টি মামলা অপ্রত্যাহারের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। অধিকন্তু সামরিক আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা প্রত্যাহার করা হয়নি। সাজাপ্রাপ্ত মামলাসমূহের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমার আবেদন করেছেন। কিন্তু উক্ত আবেদনগুলো বর্তমান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আটকে রয়েছে। মামলা প্রত্যাহারের খতিয়ান নিম্নে দেয়া গেল–

জেলা	মোট মামলা	প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত	অপ্রত্যাহৃত মামলা
রাঙ্গামাটি	৩৫০	২৮৫	৬৫*
খাগড়াছড়ি	৪৫১	৪০৫	৪৬
বান্দরবান	৩৮	৩০	৮
মোট	৮৩৯	৭২০	১১৯

*সাজাপ্রাপ্ত ৪৩টি মামলাসহ

জনসংহতি সমিতির সদস্যদের ঋণ মওকুফ, চাকরিতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসন

এই খন্ডের ১৪নং ধারায় জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা, প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাদের পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা, জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা এবং এক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করার বিধান রয়েছে।

পূর্বে চাকরিতে কর্মরত ৭৮ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যের মধ্যে ৬৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নিকট বার বার আবেদন সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতিকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি অদ্যাবধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরদিকে জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প এখনো সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। পক্ষান্তরে সরকার জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ঋণ মওকুফের আবেদন করা হলেও উক্ত ঋণ মওকুফ করা হয়নি।

সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার

এই খন্ডের ১৭নং ধারায় উল্লেখ আছে যে, সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে 'আঞ্চলিক পরিষদ' যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবে।

এই চুক্তির স্বাক্ষরের পর প্রথমে পাঁচ শতাধিক ক্যাম্পের মধ্যে মাত্র ৩১টি ক্যাম্প প্রত্যাহারের চিঠি জনসংহতি সমিতির নিকট হস্তগত হয়েছে। পক্ষান্তরে সরকার প্রচার করছে যে, এযাবৎ দুই শতাধিক ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কোন ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে তার তালিকা সম্বলিত কোন চিঠিপত্র জনসংহতি সমিতির হস্তগত হয়নি। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর একটি ব্রিগেডসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এসব ক্যাম্পের কোন তালিকা (কাগজপত্র) জনসংহতি সমিতির নিকট পাঠানো হয়নি। এছাড়া প্রত্যাহৃত ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে লংগদু উপজেলায় ২টি, বরকল উপজেলায় ২টি ও রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ১টি ক্যাম্প পুনর্বহাল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংঘাতকালীন সময়ে জারিকৃত সেনাশাসন এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ প্রশাসনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রয়েছে। 'অপারেশন দাবানল' এর পরিবর্তে ১ সেপ্টেম্বর ২০০১ হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন উত্তরণ' জারি করে একপ্রকার সেনাশাসন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এই ধারার (খ) উপ-ধারায় আরো বলা হয়েছে যে, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু চুক্তির এই ধারা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। প্রত্যাহৃত ক্যাম্পের জায়গা মূল মালিক বা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি। উপরন্তু ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল করা হচ্ছে। যেমন-

১।	বিলাইছড়ি ক্যাম্প থেকে এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন (১৭ অক্টোবর ২০০৩); এ সময় উপজেলার সাক্রাছড়ি ক্যাম্প ও গাছকাবাছড়া ক্যাম্পেও এপিবিএন সদস্যদের প্রত্যাহার করে সেনা সদস্য মোতায়েন
২।	রুমা সেনাবাহিনী গ্যারিসন স্থাপনের জন্য ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ
৩।	বান্দরবান সদর ব্রিগেড সম্প্রসারণের নামে ১৮৩ একর জমি অধিগ্রহণ
৪।	বান্দরবানে আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে ৩০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৫।	বান্দরবানে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২৬,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ
৬।	লংগদু জোন সম্প্রসারণের জন্য ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ
৭।	পানছড়ি জোন সম্প্রসারণের জন্য ১৪৩ একর জমি অধিগ্রহণ
৮।	মাটিরাঙ্গা উপজেলায় গোকুলসমমণি কার্বারী পাড়ায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
৯।	কাউখালী উপজেলার ঘাগড়ায় ঘিলাছড়ি মুখ তালুকদার পাড়ার প্রীতি বিকাশ তালুকদার ও সাধন বিকাশ চাকমার ভূমি জবরদখল করে ক্যাম্প স্থাপন (১৬ জুন ২০০৩)
১০।	মানিকছড়ি উপজেলার ২নং বাটনাতলী ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বান্যাছোলা নামক সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন (২০০৪)
১১।	লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার লক্ষ্মীছড়ি ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে বান্যাছোলা নামক স্থানে সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন (২০০৪)
১২।	কাউখালী উপজেলাধীন খিয়াম এলাকায় সেনা ক্যাম্প পুনঃস্থাপন
১৩।	রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাসা ইউনিয়নের বেতছড়া নামক স্থানে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন (জানুয়ারি ২০০৫)
১৪।	রাজস্থলী উপজেলার বাঙালহালিয়া বাজারে নতুন ক্যাম্প স্থাপন (২০০৫)
১৫।	খাগড়াছড়ি জেলার দাঁতকুপ্যা গ্রামে নতুন ক্যাম্প স্থাপন (মার্চ ২০০৭)

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাহ্যত সিভিল প্রশাসন বলবৎ থাকলেও অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে কার্যত সেনাবাহিনীই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাস্তাঘাটে চেকপোষ্ট বসিয়ে সেনাবাহিনী পূর্বের মতো প্রয়োজন মনে করলে যাত্রীবাহী বাস, লঞ্চ থেকে শুরু করে সকল প্রকার যানবাহন তল্লাসীসহ

গ্রামাঞ্চলে অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতেই সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

সকল প্রকার চাকরিতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ

এই খন্ডের ১৮নং ধারায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী পদে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগের বিধান থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রস্তাব করা হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয় সংশ্লিষ্ট সকল বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় এখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং বাস্তবক্ষেত্রেও অদ্যাবধি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে এখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন চাকরিতে বহিরাগতরা (অস্থায়ী বাসিন্দা) নিয়োগ লাভ করে চলেছে এবং এসব নিয়োগের প্রক্রিয়ায় চরম দুর্নীতি ও ক্ষমতাসীন দলের দলীয়করণ অব্যাহত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এই খন্ডের ১৯নং ধারায় বর্ণিত উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করার বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৫ জুলাই ১৯৯৮ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও ক্ষমতার তালিকা সম্বলিত Rules of Business-এর প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে (১৯৯৬-২০০১) উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এই ধারা মোতাবেক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়।

বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে (২০০২-২০০৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জন্য জুম্মদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়নি। এই ধারা লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রাখা হয়। পক্ষান্তরে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ না করে একজন উপমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। অপরদিকে এই ধারা মোতাবেক এখনো উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়নি।

ড. ফখরুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে (২০০৭-২০০৮) প্রথমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব একজন অউপজাতীয় উপদেষ্টার হাতে অর্পণ করা হয়। পরে ২০০৭ সালের নভেম্বরে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন) হিসেবে ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়কে নিয়োগ করে তাঁর হাতে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভের পর রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ দীপঙ্কর তালুকদারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয় এবং তাঁকে মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে বীর বাহাদুর উশৈসিং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন।

Rules of Business অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৯৯% জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বিষয়ে সংবেদনশীল নয়।

দ্বিতীয় অংশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে
সরকারের বক্তব্য ও তৎপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মতামত

বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ
পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর
হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর

র্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত রাঙ্গামাটিতে মেডিকেল কলেজ এব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ স্থগিত করণের দাবিতে
বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ
স্থান: ডিসি অফিস প্রাঙ্গন, রাঙ্গামাটি।
তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০
পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য ও তৎপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মতামত

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বৈঠক শুরু হয় ২৫ অক্টোবর ১৯৮৫ সালে। ১৯৯৬ সনে শেখ হাসিনা সরকার দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসলে উক্ত সরকারের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদলের ছয় দফা সংলাপের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ১৯৯৭ সনের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি ৪ (চার) খন্ডে বিভক্ত। ক খন্ডে ৪ (চার) টি, খ খন্ডে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি, গ খন্ডে ১৪ (চৌদ্দ) টি এবং ঘ খন্ডে ১৯ (উনিশ) টি সর্বমোট ৭২ (বাহাত্তর) টি ধারা রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-১৩" মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ৪ (চার) খন্ডের মধ্যে 'ক' খন্ডে ৪টি (চার), 'খ' খন্ডে ৩৫টি (পয়ত্রিশ), 'গ' খন্ডে ১৪টি (চৌদ্দ) এবং 'ঘ' খন্ডে ১৯টি (উনিশ) সর্বমোট ৭২টি (বাহাত্তর) ধারা রয়েছে। ইহার 'ক' খন্ডের ধারা ১, ২, ৩ ও ৪; 'খ' খন্ডের ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ও ৩৩; 'গ' খন্ডের ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, এবং 'ঘ' খন্ডের ১, ৫, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৯ ধারা মোট ৪৮ টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে; 'খ' খন্ডের ৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭, ৩৪; 'গ' খন্ডের ২, ৩, ৪, ৫, ৬; 'ঘ' খন্ডের ৪, ৬, ১৭, ১৮ নম্বর মোট ১৫ টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং 'খ' খন্ডের ২৬, ২৯, ৩৫; 'গ' খন্ডের ১১, ১৩; 'ঘ' খন্ডের ২, ৩, ৭, ৯, নম্বর ধারা মোট ৯ টি ধারা বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে বলে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মোট ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ইতিমধ্যে সরকার বাস্তবায়ন করেছে বলে তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, ১৫টি ধারার আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাকি ৯টি ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের উক্ত প্রতিবেদন সর্বাংশে সত্য নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মূল্যায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সর্বমোট ৭২টি ধারার মধ্যে মাত্র ২৫টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর অবাস্তবায়িত রয়েছে ৩৪টি ধারা এবং আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ১৩টি ধারা। তার অর্থ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা এখনো সম্পূর্ণভাবে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। বাস্তবায়িত ২৫টি ধারার মধ্যে উপজাতি শব্দটি বলবৎ রাখা, পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের পরিবর্তে পার্বত্য জেলা পরিষদ নামকরণ করা, ডেপুটি কমিশনারের পরিবর্তে সার্কেল চীফ শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা, চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হলে বা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে পরিষদের সভায় একজন উপজাতীয় সদস্যের সভাপতিত্ব করা, পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, সরকার শব্দের পরিবর্তে ক্ষেত্র বিশেষে পরিষদ বা মন্ত্রণালয় শব্দটি প্রতিস্থাপন করা, পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৭০ ধারা বাতিল করা, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের অস্ত্র জমাদান ইত্যাদি বিষয়গুলো রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে দেয়া হয়েছে। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টি দেখতে হবে রাজনৈতিক ও বিষয়গত তাৎপর্যের আলোকে। এটাকে সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করার বিষয় নয়।

যেমন 'ক' খন্ডের ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার যে দাবি করছে সেই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে সরকারের অসত্য বক্তব্যের চিত্র ফুটে উঠবে। জনসংহতি সমিতির মতে উক্ত চারটি ধারার মধ্যে তিনটি ধারা এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। এই তিনটি ধারা কেবল অবাস্তবায়িত অবস্থার মধ্যে রেখে দেয়া হয়নি, কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার চরমভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে। যেমন- চুক্তির 'খ' খন্ডের ১নং ধারা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে পাহাড়ি (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিধান এখনো কাগজ-কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের কোন আইনী বা কার্যগত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। সরকারের কোন অফিস আদেশ, দিক-নির্দেশনা বা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়নি। ফলে নানা কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহতভাবে বহিরাগত অভিবাসন ঘটছে। ফলে পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে

বসেছে। দ্বিতীয়ত ২নং ধারায় "যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে" মর্মে যে বিধান রয়েছে তদনুযায়ী ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ সংশোধন করা হলেও অন্যান্য অনেক জাতীয় আইন রয়েছে যেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায়ও প্রযোজ্য সেগুলো এখনো চুক্তির এই ধারা মোতাবেক পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পুলিশ আইন, বন আইন, স্থানীয় সরকার পরিষদ (ইউনিয়ন পরিবষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা) আইন, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধিবিধান ইত্যাদি সংশোধন করা হয়নি। সুতরাং সরকারের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

চুক্তির 'খ' খন্ডের ধারাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে যে, এ খন্ডের তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ৩৫টি ধারার মধ্যে ৬টি ধারা [৪(ঘ), ৯, ১৯, ২৪, ২৭ ও ৩৪ ধারা] ব্যতীত বাকী ২৯টি ধারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন অর্থে উল্লিখিত ২৯টি ধারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে সরকার দাবি করছে তা বোধগম্য নয়। ১৯৯৮ সালে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধনের মাধ্যমে উন্নয়ন সংক্রান্ত ১৯নং ধারা ব্যতীত যদিও 'খ' খন্ডের অন্যান্য সকল ধারা তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আইনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কিন্তু আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানেই তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭ বছরেও এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ৩৪-সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের পরিবর্তে এখনো অনির্বাচিত বা সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ সদস্যক অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ দিয়ে এসব তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কাজেই যেখানে আইনের প্রয়োগ নেই, সেখানে এ বিধানগুলো সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা কখনোই সঠিক হতে পারে না। বস্তুত জনমতকে বিভ্রান্তি করার হীন উদ্দেশ্যেই সরকার এভাবে বিভ্রান্তিকর, বাস্তব-বিবর্জিত ও মনগড়া দাবি করছে বলে বলা যেতে পারে।

এছাড়া সরকার যেসব ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করছে সেসব ধারাগুলোর মধ্যে সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান সংক্রান্ত ৪(ঘ) নং ধারা, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ৯নং ধারা; উন্নয়ন সংক্রান্ত ১৯নং ধারা; পার্বত্য জেলা পুলিশ গঠন সংক্রান্ত ২৪নং ধারা; জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য জমিসহ কোন জায়গা-জমি পার্বত্য জেলা পরিষদে পূর্বানুমোদন ব্যতীত ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করার উপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত ২৬নং ধারা; ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত ২৭নং ধারা এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাবলী সংক্রান্ত ৩৪নং ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হওয়ার দাবিও সর্বাংশে সঠিক নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের ভোটার তালিকা বিধিমালা বা নির্বাচন বিধিমালা যেখানে এখনো প্রণীত হয়নি, সেখানে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিষয়টি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে দাবি করা বাতুলতা বৈ কিছু নয়। পার্বত্য জেলা পুলিশ বিষয়টি যেখানে এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়নি, সেখানে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য নিয়োগ, বদলি ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। তাই সরকার এ বিষয়গুলো আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে বলে যে দাবি করছে তা নি:সন্দেহে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ও মনগড়া বলা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যান্য ধারা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সরকারি প্রতিবেদন কতটুকু সঠিক ও যথাযথ তা উল্লিখিত উদাহরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়।

নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য ও তৎপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির মতামত প্রদান করা হলো:

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ক. সাধারণ			
ক.১.	উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।	সরকারের রূপকল্প ভিশন ২০২১ এবং ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হয়েছে। (বাস্তবায়িত)	এ বিধান অনুযায়ী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সমুন্নত রাখা ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সেটেলারদের পুনর্বাসন ও গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; সাম্প্রদায়িক হামলা; বহিরাগতদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ; স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান; চাকরি প্রদান; ভূমি বেদখল অব্যাহত রয়েছে। দাবি করা সত্ত্বেও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মর্যাদা সন্নিবেশ করা হয়নি। বস্তুত সরকার কর্তৃক পরিকল্পনার রূপরেখা দেয়া হলেও তা বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
ক.২.	উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন।	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ পার্বত্য চুক্তির ধারা মতে পরিবর্তিত করে জারি করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এবং ভূমি কমিশন আইন ২০০১ জারি করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)	আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ যেমন- বাংলাদেশ পুলিশ আইন, বন আইন, স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি, তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিধিবিধান ইত্যাদি সংশোধন করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ক.৩.	এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে। (ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ঃ আহ্বায়ক (খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ঃ সদস্য (গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ঃ সদস্য	২৫-০৫-২০০৯ তারিখে জাতীয় সংসদের মাননীয় উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহবায়ক করে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি গঠনের পর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২২/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর ১২ টি ধারায় সংশোধনীর পক্ষে সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা অনুসারে সর্বশেষ গত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। (বাস্তবায়িত)	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হলেও কমিটির কোন স্বতন্ত্র দপ্তর নেই, কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনে কোন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়নি এবং কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন তহবিল প্রদান করা হয়নি। এমনকি কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও সেগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনকল্পে ১৩-দফা সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত হলেও তদনুসারে উক্ত আইন এখনো সংশোধিত হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
ক.৪.	এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।	পর্যায়ক্রমে চুক্তি অনুযায়ী কাজ চলছে। (বাস্তবায়িত)	চুক্তির বিরুদ্ধে ২০০০ সালে ও ২০০৭ সালে দায়েরকৃত পৃথক দু'টি মামলায় গত ১২-১৩ এপ্রিল ২০১০ হাই কোর্ট থেকে আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসাংবিধানিক মর্মে অবৈধ বলা হয়েছে বলে যে রায় দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত হাইকোর্টের রায়কে স্থগিত ঘোষণা করে। কিন্তু উক্ত আপীল আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সরকারের মধ্যে চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। (চলমান)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.	উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন।	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো সংযোজন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ জারি করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হলেও উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারা যথাযথভাবে সংশোধিত হয়নি। চেয়ারম্যানগণের উপমন্ত্রীর মর্যাদা পুন:প্রদান করা হয়নি। পরিষদসমূহের কার্যবিধিমালা এখনো যথাযথভাবে প্রণীত হয়নি। (আংশিক বাস্তবায়িত)
খ.১.	পরিষদের বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।	বাস্তবায়ন করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)	বাস্তবায়িত
খ.২.	"পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।	পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন সমূহ সংশোধন করে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নামকরণ করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)	বাস্তবায়িত
খ.৩.	"অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)	উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে ২১/১২/২০০০ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক অফিসাদেশের মাধ্যমে সার্কেল চীফের পাশাপাশি ডেপুটি কমিশনারদেরও সনদপত্র প্রদানের যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা প্রত্যাহারের জন্য বার বার দাবি সত্ত্বেও প্রত্যাহার করা হয়নি। ডেপুটি কমিশনাররা পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নন এমন অউপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদপত্র দিয়ে চলেছেন। উক্তরূপ সনদপত্র বিশেষত চাকরি, জমি বন্দোবস্তী, ভোটার তালিকাভুক্তি বা কোটা ব্যবস্থাধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ. পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ			
খ.৪.	ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।	জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।	নির্বাচনের মাধ্যমে এখনো পূর্ণাঙ্গ পরিষদ গঠিত হয়নি। ফলে সংরক্ষিত আসনে মহিলাদের নির্বাচিত করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
	খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।	জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।	জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত
	ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।	এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয় পার্বত্য জেলা পরিষদের আইন পর্যালোচনাক্রমে "পার্বত্য জেলাসমূহের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ পার্বত্য জেলার অধিবাসীদের চাকরিসহ সকল প্রয়োজনে স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান করতে পারবেন" মর্মে আইনগত মতামত ব্যক্ত করেছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)	উক্ত ধারা লঙ্ঘন করে ২১ ডিসেম্বর ২০০০ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত এক আদেশের মাধ্যমে সার্কেল চীফের পাশাপাশি ডেপুটি কমিশনারদেরও সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আইনকে লঙ্ঘন করে ডেপুটি কমিশনারদেরও সনদপত্র প্রদানের ক্ষমতা দেয়ার আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো সত্ত্বেও এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.৫.	৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার"-এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।	বাস্তবায়িত	এ বিধান বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। (অবাস্তবায়িত)
খ.৬.	৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
খ.৭.	১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।	বাস্তবায়িত	নির্বাচিত পরিষদ গঠিত না হওয়ায় অন্তর্বর্তী পরিষদ দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দল নিজেদের দলীয় লোকজন নিয়োগ দিয়ে ইচ্ছা মতো অন্তর্বর্তী পরিষদ পুনর্গঠন করে থাকে। (অবাস্তবায়িত)
খ.৮.	১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.৯.	বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। পার্বত্য জেলায় ভূমি মালিকানার বিষয়টি ভূমি কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে বিধায় পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নির্ধারণ হয়নি। এছাড়াও পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য পৃথক ভোটার তালিকা করা যাবে কি-না সে বিষয়ে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এটর্ণী জেনারেলের মতামত চাওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও মতামত পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ২১/১২/২০১১ তারিখে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তাগিদপত্র-১২ প্রদান করা হয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)	এ বিধান লঙ্ঘন করে পার্বত্য জেলার ভোটার তালিকায় রোহিঙ্গাসহ বহিরাগতদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের অগোচরে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ভোটাধিকার সংক্রান্ত ১৮নং ধারা চুক্তির সাথে বিরোধাত্মকভাবে সংশোধন (২০০০ সালের ৩৩, ৩৪ ও ৩৫নং আইন) করা হয়। প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আজ অবধি তা চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
খ.১০.	২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।	বাস্তবায়িত	আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও এখনো "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
খ.১১.	২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.১২.	যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সর্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।	বাস্তবায়িত	পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় সংশ্লিষ্ট চীফের যোগদানের অধিকার থাকলেও এ বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট সার্কেল চীফদের পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয় না। (অবাস্তবায়িত)
খ.১৩.	৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।	বাস্তবায়িত	অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিষদগুলোতে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে অউপজাতীয় কর্মকর্তাদের প্রেষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
খ.১৪.	ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে।	বাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
	খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।	চাকরির ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে।	আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বিধানটি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে তিন পার্বত্য জেলায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে বহিরাগত লোকদের নিয়োগ দিয়ে চলেছে। ২০১০ সালে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে ২০ জন প্রধান শিক্ষক পদের মধ্যে ১৮ জন বাঙালি ও ২ জন পাহাড়ি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
	গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।	সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। (বাস্তবায়িত)	বাস্তবায়িত
খ.১৫.	৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
খ.১৬.	৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.১৭.	ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থত এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে। খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
খ.১৮.	৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
খ.১৯.	৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম জেলা পরিষদের মাধ্যমে না হয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থানীয় স্ব স্ব অফিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে। (আংশিক বাস্তবায়িত)	উন্নয়ন সংক্রান্ত বিধান যথাযথভাবে আইনে সন্নিবেশ করা হয়নি। উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ মূল প্রতিষ্ঠান হলেও অধিকাংশ উন্নয়ন কার্যক্রম পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে পাশ কাটিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
খ.২০.	৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.২১.	৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
খ.২২.	৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাতিলাদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হওয়ার বিধান থাকলেও সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করে দলীয় লোকজনদের নিয়োগ দিয়ে অনির্বাচিত অন্তর্বর্তী পরিষদের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করছে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
খ.২৩	৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.২৪.	ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।	আংশিক বাস্তবায়িত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশ বাহিনীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে ০৪/৯/২০১০ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত স্বঃমঃ/পু-২/বিবিধ-১/২০০৫ /৯৮০ নং স্মারকে উপ-জাতীয় পুরুষ প্রার্থীদের উচচতার ক্ষেত্রে ৫'-৬" এর স্থলে ৫'-৪" শিথিলকরণ এবং মহিলা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা বিদ্যমান ৫'-২" রাখার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।	পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তৎনিম্ন স্তরের সদস্যদের নিয়োগের বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে কার্যকরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এখনো পর্যন্ত উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য জেলা পুলিশবাহিনী গঠিত হয়নি। অপরদিকে পূর্বের মতো পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুলিশবাহিনীর বদলি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষমতা সরাসরি প্রয়োগ করা হয়ে আসছে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
	খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।	আংশিক বাস্তবায়িত	পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পরিষদের কাছে দায়ী থাকার বিধান কার্যকর হয়নি। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
খ.২৫.	৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।	বাস্তবায়িত	পার্বত্য জেলায় সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান ও কর্মকর্তাদেরকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হবে মর্মে বিধান হলেও তা কার্যকর হয়নি। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.২৬.	৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত পাচবিম(প-১)-পাঃজেলা/বিবিধ/৮৫/২০০০-২৮০, তারিখঃ ২৩/১০/০১ খ্রিঃ মোতাবেক ভূমি বন্দোবস্ত স্থগিত রয়েছে।	বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও যথাযথভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। আজ অবধি উক্ত বিষয় ও ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদে যথাযথভাবে হস্তান্তর করা হয়নি। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি দোহাই দিয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ডেপুটি কমিশনারগণ নামজারি, ইজারা ও বন্দোবস্ত প্রদান প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
	খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।	(খ) চলমান	১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি দোহাই দিয়ে পরিষদের সাথে আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে ডেপুটি কমিশনারগণ অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বনায়ন ও সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ এবং পর্যটন কেন্দ্র, সেনা ক্যাম্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও সম্প্রসারণের নামে হাজার হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
	গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।	(গ) চলমান	হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি পার্বত্য জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
	কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।	(ঘ) চলমান	জলেভাসা জমিগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত না দিয়ে সেটেলার বাঙালিদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া হচ্ছে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
খ.২৭.	৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।	১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে বিধানের প্রয়োগ হয়নি। (আংশিক বাস্তবায়িত)	জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে এখনো ন্যস্ত করা হয়নি। এ ক্ষমতা এখনো ডেপুটি কমিশনারগণ প্রয়োগ করে চলেছেন। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
খ.২৮.	৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।	শর্তানুযায়ী ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সংশোধন করা হয়েছে। (বাস্তবায়িত)	এই বিধানটি আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। যেমন- পর্যটন বিষয়টি হস্তান্তরের সময় পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ মতামত দিলেও তা অগ্রাহ্য করা হয়। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.২৯.	৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।	তিন জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধানমালা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় ৯/৫/১১ তারিখে ০৭.১৩০.০২২.০০.০০.০১৮.২ ০১০ -৩০ নম্বর স্মারকমূলে নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। তৎপ্রেক্ষিতে ২৬/৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত ছক মোতাবেক চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি জেলা পরিষদসমূহ হতে চাহিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ১৮/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রবিধানের বিষয়ে মতামত পাওয়া গিয়েছে যা গত ১৮/০৯/২০১২ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর মতামত প্রদানের জন্য গত ০৫/১২/১২ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে অর্থ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য গত ০৫/১২/২০১২ তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। (চলমান)	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত না করে সরকার নিজেদের দলীয় লোকজনদেরকে পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে অর্ন্তবর্তী পরিষদ পরিচালনা করছে। ফলে এসব পরিষদসমূহ অত্যন্ত দুর্বল ও সরকারের কাছে নতজানু। কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পর যদি উক্ত বিধি পার্বত্য জেলার জন্য কষ্টকর বা আপত্তিকর হলেও এসব পরিষদসমূহ উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে সরকারের নিকট আবেদন করার বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে না। (অবাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.৩০.	ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে। খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ"- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
খ.৩১.	৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
খ.৩২.	৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।	বাস্তবায়িত	জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পূর্ণাঙ্গ পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত না করে সরকার দলীয় লোকজনদেরকে পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে অর্ন্তবর্তী পরিষদ পরিচালনা করছে। ফলে এসব পরিষদসমূহ অত্যন্ত দুর্বল ও সরকারের কাছে নতজানু। কোন আইন উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে বা আপত্তিকর হলেও পরিষদ উক্ত আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন পেশ এবং প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। (অবাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.৩৩.	ক) প্রথম তফশিলে বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃড়খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে। খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা। গ) প্রথম তফশিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।	বাস্তবায়িত	এসব কার্যাবলী আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও 'মাধ্যমিক শিক্ষা' ব্যতীত জেলার আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন; বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা; সরকার কর্তৃক রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়/কার্যাবলী এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
খ.৩৪.	পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; খ) পুলিশ (স্থানীয়); গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; ঘ) যুব কল্যাণ; ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; চ) স্থানীয় পর্যটন; ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা; ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ; ট) মহাজনী কারবার; ঠ) জুম চাষ।	আংশিক বাস্তবায়িত। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ২৩টি বিষয়/বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ২২টি বিষয়/বিভাগ, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২১টি বিষয়/বিভাগ হস্তান্তর করা হয়েছে। অপরদিকে আরো ৪টি বিষয় হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে । ক. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (রাঙ্গামাটি), খ. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর, গ. প্রজেক্ট অফিসারের দপ্তর (মাধ্যমিক শিক্ষা), ঘ. ভোকেশনাল (কারিগরি বৃত্তিমূলক ইনস্টিটিউট উক্ত ৪টি বিষয়ের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপঃ প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (রাঙ্গামাটি) হস্তান্তরের বিষয়ে ত্বরান্বিত করার জন্য গত ২৬/১০/২০১১ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ডি. ও লেটার দেয়া হয়েছে। এছাড়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর, প্রজেক্ট অফিসারের দপ্তর (মাধ্যমিক শিক্ষা), ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল খাগড়াছড়ি (কারিগরি বৃত্তিমূলক) জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং স্কুল খাগড়াছড়ি সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদে হস্তান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)	উল্লেখিত কার্যাবলীর মধ্যে যুব কল্যাণ, স্থানীয় পর্যটন, জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, মহাজনী কারবার ও জুম চাষ- এই ৫টি কার্যাবলী তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হলেও গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী যেমন- ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা; পুলিশ (স্থানীয়); উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার; পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান; স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান; কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যাবলী এখনো পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। (আংশিক বাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
খ.৩৫.	দ্বিতীয় তফশিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে : ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফি; খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর; গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর; ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর; ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস; চ) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর; ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশবিশেষ; জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর; ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশবিশেষ; ঞ) ব্যবসার উপর কর; ট) লটারীর উপর কর; ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।	চলমান	দ্বিতীয় তফশিলে বিবৃত আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এখনো পরিষদ কর্তৃক আদায় করার ক্ষমতা কার্যকর হয়নি। (অবাস্তরায়িত)
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ			
গ.১.	পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।	বাস্তবায়িত	অন্তর্বর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও এখনো নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়নি। (বাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ.২.	পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।	এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র দেয়া হলে উক্ত বিভাগ জানিয়েছে যে, ১৯৮৯ সালে ৩টি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত ৩ জন চেয়ারম্যানকে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন নাম উল্লেখ পূর্বক উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণের কার্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গকে উপমন্ত্রী বা অন্য কোন পদমর্যাদা প্রদান করা হয়নি কারণ তারা নির্বাচিত নন। বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও সরকার কর্তৃক অদ্যাবধি নতুন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। উল্লেখ্য, তিন পার্বত্য জেলায় এখনও কোন চেয়ারম্যান নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি। (আংশিক বাস্তবায়িত)	পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি এবং নির্বাচিত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়নি। নির্বাচনের বাধ্যবাধকতাকে উপেক্ষা করে একের পর এক সরকার দলীয় লোকজনদেরকে অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে অগণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করছে। এছাড়া তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের উপমন্ত্রী পদমর্যাদাও কেড়ে নেয়া হয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
গ.৩.	চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্য হতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবেঃ চেয়ারম্যান–১ জন সদস্য উপজাতীয়–১২ জন সদস্য উপজাতীয় (মহিলা)–২ জন সদস্য অ-উপজাতীয় –৬ জন সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা)–১ জন উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরুং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে। অ-উপজাতীয় সদস্যদের মধ্য হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। (আংশিক বাস্তবায়িত)	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮ প্রণীত হলেও এবং তদনুসারে অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও এখনো নির্বাচিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়নি। অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদে এ বিধান অনুযায়ী জাতি-ভিত্তিক সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ.৪.	পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। (আংশিক বাস্তবায়িত)	অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদে এ বিধান অনুসারে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত তিনটি আসনে মহিলা মনোনীত করা হয়েছে। তবে এখনো নির্বাচিত পরিষদ গঠিত হয়নি। (আংশিক বাস্তবায়িত)
গ.৫.	পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তবে অদ্যাবধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাই। (আংশিক বাস্তবায়িত)	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। তবে অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদে এ বিধান অনুসারে অন্তর্বর্তীকালীন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। (অবাস্তবায়িত)
গ.৬.	পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।	১৯৯৮ সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদকে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে সাহায্য মঞ্জুরী (বাজেট) প্রদান করা হয়। (আংশিক বাস্তবায়িত)	তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আঞ্চলিক পরিষদেরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে ১৫ বছর ধরে অন্তর্বর্তী আঞ্চলিক পরিষদ বলবৎ রয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
গ.৭.	পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ.৮.	ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন। খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূণ্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
গ.৯.	ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।	বাস্তবায়িত	আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরিষদের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করার ক্ষমতা কার্যকর করা হচ্ছে না। বস্তুত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন যোগাযোগ রাখে না বিধায় আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সাপেক্ষে পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য হবে মর্মে বিধান সংযোজনের প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
	খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।		আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বিধানটি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন সাপেক্ষে পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ইত্যাদি স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোর আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য হবে মর্মে বিধান সংযোজনের প্রস্তাব কার্যকর করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
	গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।		আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বিধানটি যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। তাই এখনো উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পুলিশ বিভাগ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ডেপুটি কমিশনারগণ পূর্বের মতো আইন লঙ্ঘন করে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। তাই অনতিবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। (অবাস্তবায়িত)
	ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।		এই বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও কার্যকর করা হয়নি। ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিষদকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। বস্তুত তিন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারদের হাতেই অদ্যাবধি এ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
	ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।		আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলায় নিয়োজিত বিচারকগণ বিচারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, প্রথা ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন না এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও সার্কেল চীফ-হেডম্যানদের মতামত গ্রহণ করেন না। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
	চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।		চন্দ্রঘোনা রেয়ন ও পেপারমিলের পরিচালনা ও প্রশাসনে আঞ্চলিক পরিষদকে অদ্যাবধি উপেক্ষা করা হচ্ছে। মানিকছড়ির সিমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন আলোচনা করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
গ.১০.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।	বাস্তবায়িত	এই বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অবজ্ঞা করে চলেছে। সরকার একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে যা আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং প্রশাসন ও উন্নয়নে জটিলতা সৃষ্টি করবে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
	ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভুক্ত থাকিবে।		আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও তা কার্যকর করা হয়নি। তিন পার্বত্য জেলায় নিয়োজিত বিচারকগণ বিচারের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন, প্রথা ও পদ্ধতি অনুসরণ করেন না এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও সার্কেল চীফ-হেডম্যানদের মতামত গ্রহণ করেন না। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
	চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।		চন্দ্রঘোনা রেয়ন ও পেপারমিলের পরিচালনা ও প্রশাসনে আঞ্চলিক পরিষদকে অদ্যাবধি উপেক্ষা করা হচ্ছে। মানিকছড়ির সিমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে কোন আলোচনা করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
গ.১০.	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।	বাস্তবায়িত	এই বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত হলেও উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন অবজ্ঞা করে চলেছে। সরকার একতরফাভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে যা আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং প্রশাসন ও উন্নয়নে জটিলতা সৃষ্টি করবে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
গ.১৪.	নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবেঃ ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ; খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা; গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান; ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা; চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ; ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।	বাস্তবায়িত	শুধুমাত্র তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ১০% হারে অর্থ অনিয়মিতভাবে পরিষদ তহবিলে প্রদান করা হচ্ছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
ঘ. পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী			
ঘ.১.	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিরি পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।	বাস্তবায়িত	১২,২২২ পাহাড়ি শরণার্থী পরিবার প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। সিংহভাগ আর্থিক সুবিধাদি পূরণ করা হলেও শরণার্থীদের জায়গা-জমি প্রত্যর্পণ করা করা হয়নি। ৯,৭৮০ পরিবার তাদের জমি ফেরৎ পায়নি ও ৮৯০ পরিবার হালের গরুর টাকা পায়নি। ৭১২ জন প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ এখনো মওকুফ করা হয়নি। এছাড়া স্থানান্তরিত বা বেদখলকৃত ৬টি বিদ্যালয়, ৫টি বাজার ও ৭টি মন্দির পুনর্বহাল করা হয়নি। প্রত্যাগত শরণার্থীদের ৪০টি এখনো সেটেলার বাঙালিদের দখলে রয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ.২.	সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চূড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভুক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।	ভূমি জরিপ কাজ এখনো শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন প্রথমত ভূমির বিবাদ নিস্পত্তি করবে, তারপর জরিপের কাজ করবে। (চলমান)	অবাস্তবায়িত
ঘ.৩.	সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।	তিন পার্বত্য জেলার বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে বিগত ২৩/১০/২০০১ তারিখ থেকে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত পাচবিম(প-১)-পাঃ জেলা/বিবিধ/৮৫/ ২০০০-২৮০, তারিখঃ ২৩/১০/০১ খ্রিঃ মোতাবেক তিন পার্বত্য জেলায় ভূমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। (চলমান)	অবাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ.৪.	জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।	১৯-০৭-২০০৯ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তার মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে তবে এখন পর্যন্ত ভূমি মন্ত্রণালয় হতে কোন বিচারপতি নিয়োগ করা বা বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়নি। উল্লেখ্য, তিন পার্বত্য জেলার জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ এর ২৩ টি ধারা সংশোধন/সংযোজনের জন্য আঞ্চলিক পরিষদ প্রস্তাব প্রেরণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এবং সংসদ উপনেতা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক এর সভাপতিত্বে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৩ টি ধারা সংশোধনের বিষয়ে চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করে গত ৫/০৬/২০১২ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা অনুসারে গত ২৭/০৫/২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। (আংশিক বাস্তবায়িত)	ভূমি কমিশন গঠিত হলেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু হয়নি। ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের জন্য একের পর এক সভা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এখনো উক্ত আইনটি সংশোধন করা হয়নি। এ আইনের সংশোধন সংক্রান্ত বিল গত ১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলেও সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে তা ঝুলিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন করে সরকার গঠিত হওয়ার পর গত সেপ্টেম্বরে ভূমি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হলেও এবং গত ২৭ অক্টোবর ২০১৪ প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর আহ্বানে ভূমি কমিশন আইন সংশোধন বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলেও উক্ত আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি ঘটেনি। ভূমি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধন না হওয়ার কারণে কমিশন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করতে পারেনি। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। (অবাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ.৫.	এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবেঃ ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি; খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট); গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি; ঘ) বিভাগীয় কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
ঘ.৬.	ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।	(ক) বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
	খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।	(খ) ভূমি কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত। (চলমান)	পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এ কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন ও রীতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। 'পদ্ধতি' শব্দটি সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। (অবাস্তবায়িত)
ঘ.৭.	যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।	ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থীদের খেলাপী ঋণ সংক্রান্ত প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফ পূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপী ঋণ মওকুফ করণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে গত ৩১/১০/২০১২ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। (চলমান)	৭১৮ জন প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থীদের ব্যাংক ঋণ এখনো মওকুফ করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ.৮.	রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।	বাস্তবায়িত	প্রায় ২০০০ প্লটের প্রায় ৫০ হাজার একর জমির লীজ এখনো বাতিল করা হয়নি। নতুন করে ইজারা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। মহাজোট সরকারের আমলে ২০০৯ সালে বান্দরবান জেলায় ৫৯৩টি প্লট বাতিল করা হলেও অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অধিকাংশ প্লট আবার পুনর্বহাল করা হয়। (অবাস্তবায়িত)
ঘ.৯.	সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।	বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বেসামরিক পর্যটন সচিব উপস্থিত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয় হতে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া গত ১৮/৪/১১ ইং তারিখে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ভাষায় ট্যুর গাইড তৈরীকরণ। (চলমান)	উন্নয়নসহ পর্যটন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয় না। পর্যটন বিষয়টিও যথাযথভাবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
ঘ.১০.	কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।	বাস্তবায়িত	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সরকারি চাকরিতে কোটা সংরক্ষিত থাকলেও তা যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। (আংশিক বাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ.১১.	উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।	বাস্তবায়িত	আঞ্চলিক পরিষদের কোন মতামত ছাড়াই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ প্রণীত হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে পাহাড়িদেরকে বাঙালি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। জুম্মদের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় ও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে জুম্মদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখা হয়েছে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)
ঘ.১২.	জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
ঘ.১৩.	সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
ঘ.১৪.	নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।	বাস্তবায়িত	৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও আজ অবধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে গেজেট জারি করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
ঘ.১৫.	নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
ঘ.১৬.	জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।	বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
	ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।	ক) বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
	খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।	খ) বাস্তবায়িত	এ বিধান অনুসারে জেলে অন্তরীণ ১৯ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তবে ৭২০টি মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও আজ অবধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে গেজেট জারি করা হয়নি। (আংশিক বাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
	গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।	গ) বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত
	ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।	ঘ) আংশিক বাস্তবায়িত প্রাথমিকভাবে মোট ১৩৬১ জনের তালিকা পাওয়া গেছে। প্রথম দফায় ৬৪২ জনের ঋণ মওকুফ পূর্বক সমন্বয় করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ৭১৯ জনের মধ্যে ৩৩ জনের ঋণ ইতোমধ্যেই স্ব উদ্যোগে সমন্বয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৮৬ জনের অপরিশোধিত খেলাপি ঋণ মওকুফ করণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মতামত ও তালিকা চাওয়া হয় । সে প্রেক্ষিতে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে গত ৩১/১০/২০১২ তারিখে ৬৮৬ জনের একটি তালিকা, ৩৩ জনের একটি তালিকা এবং নতুন ১৬০ জনের একটি তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	জনসংহতি সমিতির ৪ জন সদস্যের মোট ২২,৭৮৩ টাকার ঋণ মওকুফের আবেদন করা হলেও উক্ত ঋণ মওকুফ করা হয়নি। (অবাস্তবায়িত)
	ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।	ঙ) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন	পূর্বে চাকরিতে ছিলেন ৭৮ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যের মধ্যে ৬৪ জনকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের নিকট বার বার আবেদন সত্ত্বেও তাদের অনুপস্থিতকালীন সময়কে কোয়ালিফাইং সার্ভিস হিসেবে গণ্য করা, জ্যেষ্ঠতা প্রদান, বেতন স্কেল নিয়মিত করা ও সংশ্লিষ্ট ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত বিষয়টি অদ্যাবধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
	চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।	চ) বাস্তবায়িত	১৯৯৮ সনের জুন-জুলাই মাসে জনসংহতি সমিতি সদস্যদের দাখিলকৃত ১৪২৯টি আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প এখনো সরকার ঝুলিয়ে রেখেছে। (অবাস্তবায়িত)
	ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।	ছ) বাস্তবায়িত	জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধতা দেয়া হয়েছে। তবে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়নি। (আংশিক বাস্তবায়িত)
ঘ.১৭.	ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমন্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।	ক) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	এ চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাঁচ শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্পের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬৬টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে চুক্তির পর ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে একপ্রকার সেনাকর্তৃত্ব জারি করা হয়। প্রায় চার শতাধিক অস্থায়ী ক্যাম্প ও সেনা কর্তৃত্ব 'অপারেশন উত্তরণ' এখনো প্রত্যাহার করা হয়নি। অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। (অবাস্তবায়িত ও লঙ্ঘিত)

ধারা	চুক্তির বিষয়	সরকারের বক্তব্য	জনসংহতি সমিতির মতামত
	খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।	খ) বাস্তবায়িত	প্রত্যাহারকৃত কিছু ক্যাম্পের পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহৃত না হওয়ায় এখনো জুম্মদের অনেক জমি সেনা ক্যাম্পের দখলে রয়েছে। (আংশিক বাস্তবায়িত)
ঘ.১৮.	পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে	এ বিধান যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। কিন্তু উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। তাই বাস্তবক্ষেত্রেও তা অদ্যাবধি অনুসরণ করা হচ্ছে না। (আংশিক বাস্তবায়িত)
ঘ.১৯.	উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে। ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী; ২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ; ৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৫) চেয়ারম্যান/ প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ; ৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি; ৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি; ৮) সাংসদ, বান্দরবান; ৯) চাকমা রাজা; ১০) বোমাং রাজা; ১১) মং রাজা; ১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।	বাস্তবায়িত	Rules of Business অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না। মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক বিষয়ে সংবেদনশীল নয়। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকরকরণসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে উপদেষ্টা কমিটির কোন বৈঠক ডাকা হয় না। বস্তুত উপদেষ্টা কমিটি নামে মাত্র রয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়। (বাস্তবায়িত)

উন্নয়নের নামে জুম আগ্রাসন বন্ধ কর.
আদিবাসী নারী নির্যাতন বন্ধ কর
মানসম্মত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নিশ্চিত কর.

তৃতীয় অংশ

বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সহিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।

ক) সাধারণ

১। উভয় পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন;

২। উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র ইহার বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐকমত্য ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানাবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন;

৩। এই চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করিবার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবে।

(ক) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ঃ আহ্বায়ক

(খ) এই চুক্তির আওতায় গঠিত টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান ঃ সদস্য

(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ঃ সদস্য

৪। এই চুক্তি উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত ও সহি করিবার তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। বলবৎ হইবার তারিখ হইতে এই চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষ হইতে সম্পাদনীয় সকল পদক্ষেপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

খ) পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদ

উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, বান্দরবন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একমত হইয়াছেন ঃ

১। পরিষদের বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত "উপজাতি" শব্দটি বলবৎ থাকিবে।

২। "পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ" এর নাম সংশোধন করিয়া তদ্‌পরিবর্তে এই পরিষদ "পার্বত্য জেলা পরিষদ" নামে অভিহিত হইবে।

৩। "অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা বাসিন্দা" বলিতে যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন তাহাকে বুঝাইবে।

৪। ক) প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকিবে। এইসব আসনের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয়দের জন্য হইবে।

খ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১, ২, ৩ ও ৪ - মূল আইন মোতাবেক বলবৎ থাকিবে।

গ) ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৫)-এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ঘ) ৪ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে- "কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সার্কেলের চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় হিসাবে কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না"।

৫। ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যপদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন। ইহা সংশোধন করিয়া "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার" - এর পরিবর্তে "হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি" কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন- অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে।

৬। ৮ নম্বর ধারার চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "নির্বাচন বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৭। ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

৮। ১৪ নম্বর ধারায় চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

৯। বিদ্যমান ১৭নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন; (২) তাঁহার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয়; (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাহাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষণা না করিয়া থাকেন; (৪) তিনি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।

১০। ২০ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারায় "নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ" শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হইবে।

১১। ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া বিধান থাকিবে।

১২। যেহেতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহেতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত "খাগড়াছড়ি মং চীফ" এর পরিবর্তে "মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হইবে। অনুরূপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সর্কেলের চীফেরও উপস্থিত থাকার সুযোগ রাখা হইবে। একইভাবে বান্দরবান জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের সভায় যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া বিধান রাখা হইবে।

১৩। ৩১ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ পরিষদে সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে উপজাতীয় কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৪। ক) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

খ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হইবে ঃ "পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদেরকে বদলি ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে"।

গ) ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলি, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া বিধান থাকিবে।

১৫। ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকিবে।

১৬। ৩৬ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এর তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

১৭। ক) ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থতঃ এর মূল আইন বলবৎ থাকিবে।

খ) ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপধারা (ঘ)তে বিধি অনুযায়ী হইবে বলিয়া উল্লেখিত হইবে।

১৮। ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হইবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে।

১৯। ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হইবে ঃ পরিষদ সরকার হইতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে, এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।

২০। ৪৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২১। ৫০, ৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করিতে পারিবে। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ লাভ করিয়া থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। ৫৩ ধারার (৩) উপ-ধারার "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলি বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "এই আইন" শব্দটির পূর্বে "পরিষদ বাতিল হইলে নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হইবে।

২৩। ৬১ নম্বর ধারার তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের" শব্দটির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৪। ক) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদনিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলি ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার বজায় রাখিতে হইবে।

খ) ৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলির বাতিল করিয়া তদ্‌পরিবর্তে "যথা আইন ও বিধি অনুযায়ী" শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হইবে।

২৫। ৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সহায়তা দান করা" শব্দগুলি বলবৎ থাকিবে।

২৬। ৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হইবে ঃ

ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

খ) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও ইহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

গ) পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ঘ) কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা (Fringe Land) জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।

২৭। ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকিবে।

২৮। ৬৭ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পরিষদ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করিবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে কাজের সমন্বয় বিধান করা যাইবে।

২৯। ৬৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পরেও উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনার্থে পরিষদ কর্তৃক সরকারের নিকট আবেদন করিবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।

৩০। ক) ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত এবং তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত "করিতে পারিবে" এই শব্দগুলির পরে নিম্নোক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

খ) ৬৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত "পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ" -- এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩১। ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হইবে।

৩২। ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করিয়া নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হইবে ঃ পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। ক) প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলীর ১ নম্বর "শৃঙ্খলা" শব্দটির পরে "তত্ত্বাবধান" শব্দটি সন্নিবেশ করা হইবে।

খ) পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমূলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।

গ) প্রথম তফসিলে পরিষদের কার্যাবলীর ৬(খ) উপ-ধারায় "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হইবে।

৩৪। পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য ও দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

ক) ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;
খ) পুলিশ (স্থানীয়);
গ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার;
ঘ) যুব কল্যাণ;
ঙ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
চ) স্থানীয় পর্যটন;
ছ) পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান;
জ) স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান;
ঝ) কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা;
ঞ) জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ;
ট) মহাজনী কারবার;
ঠ) জুম চাষ।

৩৫। দ্বিতীয় তফশিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে ঃ

ক) অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি;
খ) পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;
গ) ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;
ঘ) গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;
ঙ) সামাজিক বিচারের ফিস;
চ) সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;
ছ) বনজ সম্পদের উপর রয়েলটির অংশবিশেষ;
জ) সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;
ঝ) খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্টা সমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়েলটির অংশবিশেষ;
ঞ) ব্যবসার উপর কর;
ট) লটারীর উপর কর;
ঠ) মৎস্য ধরার উপর কর।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করিবার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ ইং (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হইবে।

২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন যাহার পদমর্যাদা হইবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হইবেন।

৩। চেয়ারম্যানসহ পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা হইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হইবে। পরিষদ ইহার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ

চেয়ারম্যান ১ জন
সদস্য উপজাতীয় ১২ জন
সদস্য উপজাতীয় (মহিলা) ২ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় ৬ জন
সদস্য অ-উপজাতীয় (মহিলা) ১ জন

উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে ৫ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে, ৩ জন মার্মা উপজাতি হইতে, ২ জন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে, ১ জন মুরুং ও তনচৈঙ্গ্যা উপজাতি হইতে এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

অ-উপজাতীয় সদস্যদের মধ্যে হইতে প্রত্যেক জেলা হইতে ২ জন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হইতে ১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হইতে ১ জন নির্বাচিত হইবেন।

৪। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন) টি আসন সংরক্ষিত রাখা হইবে। এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) অ-উপজাতীয় হইবে।

৫। পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। তিন পার্বত্য জেলার চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে। পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

৬। পরিষদের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদ বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত ও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরূপ হইবে।

৭। পরিষদে সরকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৮। ক) যদি পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ শূণ্য হয় তাহা হইলে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে একজন তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবেন।

খ) পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারণে শূণ্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তাহা পূরণ করা হইবে।

৯। ক) পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করাসহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে। ইহা ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব কিংবা কোনরূপ অসংগতি পরিলক্ষিত হইলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

খ) এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করিবে।

গ) তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে।

ঘ) আঞ্চলিক পরিষদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করিতে পারিবে।

ঙ) উপজাতীয় আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকিবে।

চ) পরিষদ ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

১০। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতীয় প্রার্থীকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন।

১১। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসংগতি আইনের মাধ্যমে দুর করা হইবে।

১২। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার অন্তর্বর্তীকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিয়া তাহার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারিবেন।

১৩। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নুতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।

১৪। নিম্নোক্ত উৎস হইতে পরিষদের তহবিল গঠন হইবে ঃ

ক) জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা;

গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান;

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ;

ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

ঘ) পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলী

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা পুনস্থাপন এবং এই লক্ষ্যে পুনর্বাসন, সাধারণ ক্ষমাপ্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে পৌঁছিয়াছেন এবং কার্যক্রম গ্রহণে একমত হইয়াছেন ঃ

১। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থানরত উপজাতীয় শরণার্থীদের দেশে ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে সরকার ও উপজাতীয় শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ০৯ মার্চ '৯৭ইং তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮শে মার্চ '৯৭ইং হইতে উপজাতীয় শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি পক্ষ হইতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হইবে। তিন পার্বত্য জেলার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ করিয়া একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতীয় শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জরিপ কাজ শুরু এবং যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে জায়গা-জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করতঃ উপজাতীয় জনগণের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করিয়া তাহাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করিবেন।

৩। সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতীয় পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করিতে পরিবার প্রতি দুই একর জমি স্থানীয় এলাকায় জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেওয়া নিশ্চিত করিবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হইবে।

৪। জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হইবে। পুনর্বাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা ছাড়াও এযাবৎ যেইসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভাবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হইয়াছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলিবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফ্রিঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

৫। এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের লইয়া গঠন করা হইবে ঃ

ক) অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি;

খ) সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট);

গ) আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি;

ঘ) বিভাগীয় কমিশার/অতিরিক্ত কমিশনার

ঙ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

৬। ক) কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হইবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে।

খ) কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। যে উপজাতীয় শরণার্থীরা সরকারের সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন অথচ বিবাদমান পরিস্থিতির কারণে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করিতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

৮। রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দ ঃ যে সকল অ-উপজাতীয় ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হইবে।

৯। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করিবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশ বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের জন্য পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নে উৎসাহ যোগাইবেন।

১০। কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রদান ঃ চাকরি ও উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌঁছা পর্যন্ত সরকার উপজাতীয়দের জন্য সরকারি চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখিবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকার অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করিবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করিবেন।

১১। উপজাতীয় কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সচেষ্ট থাকিবেন। সরকার উপজাতীয় সংস্কৃতির কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা ও সহায়তা করিবেন।

১২। জনসংহতি সমিতি ইহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আয়ত্বাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র ও গোলবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

১৩। সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। জনসংহতি সমিতির তালিকাভূক্ত সদস্যদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে।

১৪। নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাহাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করিবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ সকল মামলা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

১৫। নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হইলে সরকার তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

১৬। জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হইবে।

ক) জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যকে পুনর্বাসেনর লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/= টাকা প্রদান করা হইবে।

খ) জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে যাহাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারি পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচারে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হইবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হইবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকিলে তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে।

গ) অনুরূপভাবে অস্ত্র সমর্পন ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন কারণে কাহারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাইবে না।

ঘ) জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু বিবাদমান পরিস্থিতির জন্য গৃহীত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাহাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হইবে।

ঙ) প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যাহারা পূর্বে সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ছিলেন তাহাদেরকে স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল করা হইবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাহাদের পরিবারের সদস্যদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরিতে নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে তাহাদের বয়স শিথিল সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করা হইবে।

চ) জনসংহতি সমিতির সদস্যদের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

ছ) জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের বৈদেশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৭। ক) সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সাথে সাথে সীমন্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থায়ী সেনানিবাস (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলিকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরত নেওয়া হইবে এবং এই লক্ষ্যে সময়-সীমা নির্ধারণ করা হইবে। আইন-শৃংখলা অবনতির ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে এবং এই জাতীয় অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

খ) সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত জায়গা-জমি প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।

১৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগ করা হইবে। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হইতে প্রেষণে অথবা নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাইবে।

১৯। উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে।

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী;

২) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ;

৩) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ;

৪) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ;

৫) চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;

৬) সাংসদ, রাঙ্গামাটি;

৭) সাংসদ, খাগড়াছড়ি; ৮) সাংসদ, বান্দরবান;

৯) চাকমা রাজা;

১০) বোমাং রাজা;

১১) মং রাজা;

১২) তিন পার্বত্য জেলা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকার স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অউপজাতীয় সদস্য।

এই চুক্তি উপরোক্তভাবে বাংলাভাষায় প্রণীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতাবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্)
আহ্বায়ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি
বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে

(জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা)
সভাপতি
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে
আলোচনা সভা

ভূমির মালিকানা
নিশ্চিত
করনে
র্বত্য চট্টগ্রাম
চুক্তির
দ্রুত
াস্তবায়ন
চাই.
পার্বত্যচট্টগ্রাম চুক্তির ১৬ তম বর্ষপূর্তি
আলোচনা সভা
ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন
শ্রী তাপস হোড়
সুজন
01 12 2013

Parbatya Chattagram Chukti Bastabayan Prasange \ 2 December 2014
published by Information and Publicity Department of Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) on 2 December 2014 from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.
Telefax: +880-351-61248, E-mail: pcjss.org@gmail.com,
Web: www.pcjss-cht.org